অক্টোবর ২০১৩, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

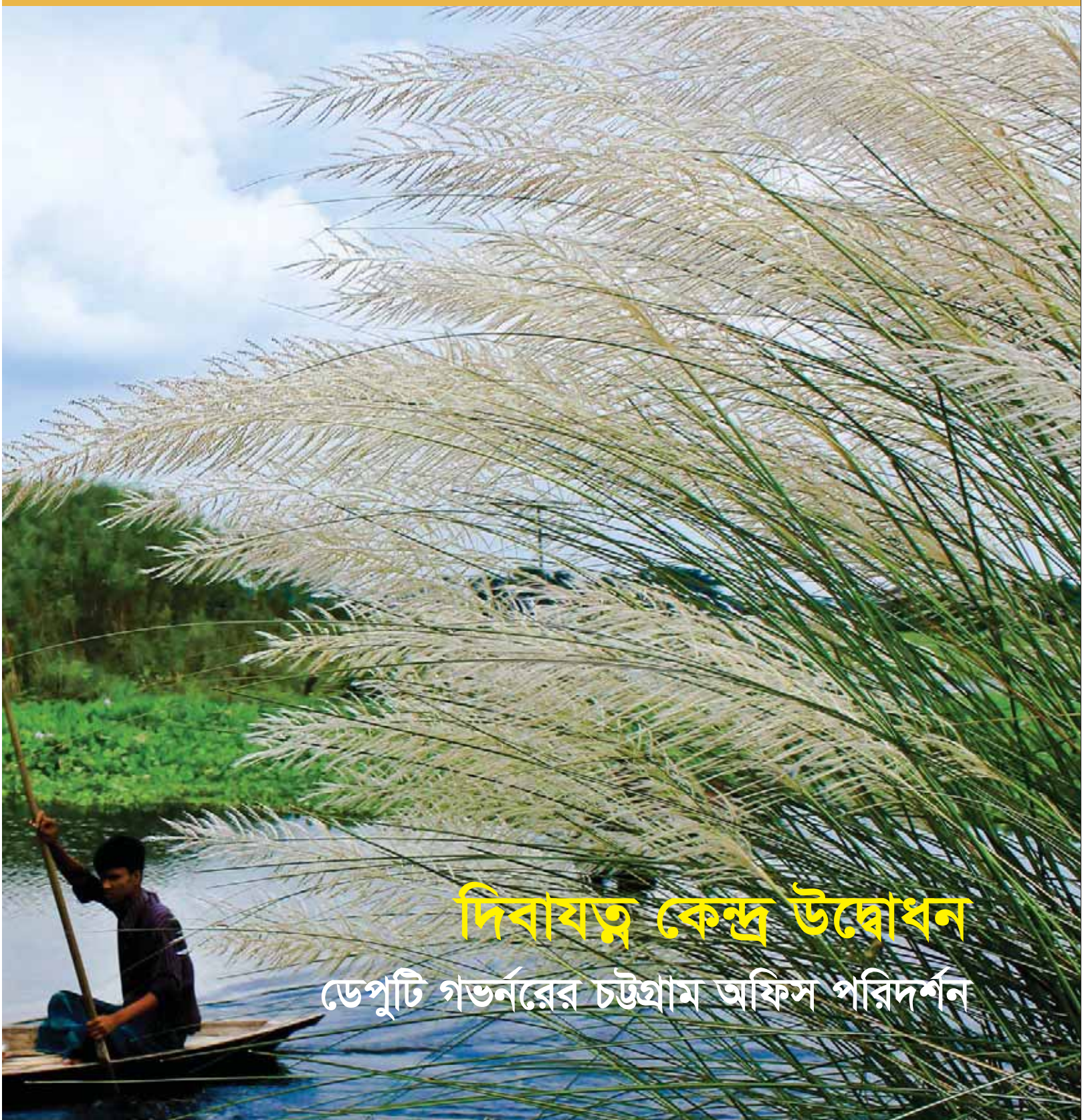

দিবাযত্ন কেন্দ্র উদ্বোধন

ডেপুটি গভর্নরের চট্টগ্রাম অফিস পরিদর্শন

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা পর্বের এবারের অতিথি কাজী শরফুদ্দিন আহমেদ। ১৯৬৪ সালে তিনি তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই কর্মকর্তা একান্তে তার নিভৃত কিছু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিবেদকের সাথে।

কাজী শরফুদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন যুগ্ম পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

কর্মময় জীবনের পর বর্তমান সময় কিভাবে কাটছে ?

২০০০ সালে আমি অবসর নিয়েছি। ৩৬ বছর কর্মময় জীবনের পর অবসর জীবনটা আসলে ভালোই কাটছে। চাকরি জীবনের সময়টা যে পরাধীন তা বলবো না। তবে অবসর জীবনটা ব্যবহার করা যায় সম্পূর্ণ নিজের মতো করে। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ে কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি। স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। এক মেয়ে শিক্ষক ও অপর মেয়ে চিকিৎসক। ওদের সাথেই আমার সারা দিন কেটে যায়।

আপনার যোগদানের সময়ের অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন–

আমার প্রথম চাকরি ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আয়কর বিভাগে। পরিবেশ ভালো লাগেনি বলে তা ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করি। বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার প্রথম পোস্টিং ছিল পিএডি'তে। যোগদান করে দেখলাম সেখানে অফিস শুরু হয় সময়মতো কিন্তু শেষ হয় রাত তিনটায়। সকল হিসাব মেলানোর পর। সে সময় সত্যিই খুব কষ্ট হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে লাগলাম। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ- বিআরপিডি, এসিডি ইত্যাদিসহ ঢাকার বাইরে বগুড়া ও চট্টগ্রাম অফিসে কাজ করলাম। একসময় অফিসকে, অফিসের কাজকে ভালবাসতে শুরু করলাম।

স্বাধীনতাপূর্ব স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু বলুন–

স্বাধীনতাপূর্ব স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে ভীতিময় অবস্থায় কাজ করতে হয়েছে। স্বাধীনতার বছর আমাদের যে ভয়ানক উৎকণ্ঠার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তা স্মরণ করলে এখনও ভীতির সঞ্চার হয়। সেই সময়কার কথা আমি আজও ভুলতে পারি না।

বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন–

কাজের পাশাপাশি আমি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলাম। সে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার বিষয় নিয়ে যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণের সময় আমি তার সাথে ছিলাম। দল-মত নির্বিশিষে সকলের সমস্যার সমাধান করা হতো। ব্যাংকের কর্মীদের সমস্যার সমাধান করাই ছিল মুখ্য বিষয়।

বর্তমান যুগের বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিবর্তন বা কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক ক্ষেত্রেই। আগে যেখানে সিআইবি রিপোর্টের জন্য ব্যাংকগুলোকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে থাকতে হতো, এখন সেখানে অনলাইন সিস্টেম চালু হয়েছে এবং ব্যাংকগুলো এখন সরাসরি ডাটাবেজ থেকে সিআইবি রিপোর্ট নিয়ে নিতে পারে। নতুনভাবে প্রণীত MICR চেকের ফলে ক্লিয়ারিং এর ক্ষেত্রেও অনেক কম সময় লাগছে। বর্তমান সময়ে কৃষি ও এসএমই শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত ব্যবস্থাগুলোও প্রশংসার যোগ্য। তবে আমি মনে করি নতুন নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি এর যথাযথ প্রয়োগ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন–

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির সাথে তাল মিলিয়ে এ দায়িত্ব প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। একথা স্মরণ রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এই উদ্যোগের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম
ইন্দ্রাণী হক
বিশ্বজিত বসাক

■ **প্রচ্ছদ**
মালেক টিপু

■ **গ্রাফিক্স**
মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

ডেপুটি গভর্নরের চট্টগ্রাম অফিস পরিদর্শন

চট্টগ্রাম অফিসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিদর্শনে ডেপুটি গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিস পরিদর্শন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঐদিনই তিনি অফিস চত্বরে চক্রেসো-ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর এটিএম বুথ এর উদ্বোধন করেন।

এটিএম বুথ উদ্বোধন করছেন ডেপুটি গভর্নর এস.কে. সুর চৌধুরী

এটিএম বুথ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে. এস. তাবরেজ, বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। প্রধান অতিথি প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন এবং চক্রেসো ও ডাচ-বাংলা ব্যাংককে যুগোপযোগী এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিস ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চক্রেসো ম্যানেজিং কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ডেপুটি গভর্নর চট্টগ্রাম অফিসের কনফারেন্স রুমে চট্টগ্রামস্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে 'ব্যবসা-বাণিজ্যে চট্টগ্রামের সমস্যা ও সম্ভাবনা সংক্রান্ত' এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্তের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরে ডেপুটি গভর্নর কনফারেন্স রুমে চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এ সভায় অফিস এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বিকেলে ডেপুটি গভর্নর চট্টগ্রাম অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকের সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক প্রধানদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। ব্যাংকারগণ কোনো কোনো ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ঋণ খেলাপি হওয়ার বিষয়ে তাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। ডেপুটি গভর্নর এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রুডেন্সিয়াল গাইড লাইন্স অনুসরণপূর্বক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতীয় শোক দিবস-২০১৩ উপলক্ষে শোক দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৬ আগস্ট ২০১৩ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত এ

ড. আতিউর রহমান আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। উদ্‌যাপন পরিষদের আহ্বায়ক মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা সভায় সভাপতিত্ব করেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনায় অংশ নেন সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোঃ ফায়েক উজ্জামান, সাংবাদিক ও কলামিস্ট মোজাম্মেল বাবু, বঙ্গবন্ধু পরিষদ- ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোহাম্মদ দিদার আলী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ব্যাংক ক্লাব ঢাকার জিমনেশিয়াম উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জিমনেশিয়াম ২৯ আগস্ট ২০১৩ উদ্বোধন করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৩০তলা ভবনের চতুর্থ তলায় স্থাপিত জিমনেশিয়ামটির উদ্বোধন করেন। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শারীরিক সুস্থতা ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে জিমনেশিয়াম

গভর্নর ড. আতিউর রহমান জিমনেশিয়াম উদ্বোধন করছেন

স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য গভর্নর ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জিমনেশিয়ামের যন্ত্রপাতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও পুরুষ ও মহিলারা যাতে পৃথক পৃথকভাবে শরীরচর্চা করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষকে গভর্নর পরামর্শ দেন। তিনি জিমনেশিয়ামে একজন দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

ভুটান এফআইইউ'কে Technical Assistance প্রদান

ভুটান এফআইইউ এবং সে দেশের সংশ্লিষ্ট অন্য স্টেকহোল্ডারদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হতে ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার এফআইইউ প্রতিনিধিগণ যৌথভাবে Technical Assistance Mission পরিচালনা করেন। বিএফআইইউ প্রতিনিধি দলে উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে যুগ্ম পরিচালক এ কে এম রমিজুল ইসলাম এবং উপ পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ প্রতিনিধি দলটি ভুটানের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং ও সুপারভিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পুলিশ, এ্যাটর্নী জেনারেলের অফিসসহ এফআইইউ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং স্ব স্ব দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। উল্লেখ্য, বিএফআইইউ কর্তৃক প্রথমবারের মতো কোন দেশকে এধরনের Technical Assistance প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের পক্ষ হতে রয়্যাল মনিটারী অথরিটি অব ভুটানের গভর্নর মি. দাও তেনজিনকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করা হয়

বার্ষিক নাটক মঞ্চায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার বার্ষিক নাটক-২০১৩ 'নদীর তীরে বাউল' ১৯ জুন ২০১৩ প্রধান কার্যালয়ের ৩০ তলা ভবনের ব্যাংকিং হলে মঞ্চস্থ

নদীর তীরে বাউল নাটকের একটি দৃশ্য

হয়। নাট্যানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি মোঃ সহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে অল্প সময়ের মধ্যে ক্লাবের প্রায় সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বর্তমান পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান নাটকের সকল কলাকুশলী, নাট্যকার ও প্রমোটরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

খুলনা অফিস

খুলনায় শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ৫ আগস্ট ২০১৩ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের মাঝে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী/কর্মকর্তা কল্যাণ তহবিলের শিক্ষা বৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়। খুলনা অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ২০১২ সালে এসএসসি ও এইচএসসি

মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস শিক্ষার্থীদের চেক হস্তান্তর করেন

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনকারী ৩৬ জন শিক্ষার্থী এবং ব্যাংকে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ১১ জন শিক্ষার্থী সন্তানকে তিন লক্ষাধিক টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

খুলনা অফিসে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ২৮- ৩০ জুলাই ২০১৩ নতুন যোগদানকারী ১৪ জন অফিসার (ক্যাশ) এবং ৪৪ জন মুদ্রা ও নোট পরীক্ষক এর জন্য তিনদিন ব্যাপী একটি ইন হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অফিসের কনফারেন্স হলে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন গোবিন্দ লাল গাইন (উপ মহাব্যবস্থাপক, ব্যাংকিং);

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস

এস,এম, সুজাবত আলী (যুগ্ম ব্যবস্থাপক, ক্যাশ); রুহুল আমিন (উপ ব্যবস্থাপক, ক্যাশ) ও ফিরোজ আলম খান (সহকারী ব্যবস্থাপক, ক্যাশ)। প্রশিক্ষণে ক্যাশ বিভাগের বিভিন্ন শাখার কার্যপদ্ধতি, প্রশাসনিক বিষয় এবং হলে পরিপালনযোগ্য নির্দেশনাবলীর বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়।

পদোন্নতি

প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক ২৯ আগস্ট ২০১৩ মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে বি.এসসি কৃষি (সম্মান) এবং ঢাকার নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ যেমন পল্লি ঋণ প্রকল্প বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স উপ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোঃ মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন খান ২৯ আগস্ট ২০১৩ মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে বিবিটিএ'তে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মার্কেটিংয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। মোশাররফ হোসেন খান ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি প্রধান কার্যালয়ের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসহ বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে কাজ করেছেন।

বরিশাল অফিস

বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

মঞ্চে উপবিষ্ট মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ হানিফ হাওলাদার

ব্যাংকার্স ক্লাব, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্য সাংস্কৃতিক ও আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২৩ আগস্ট, ২০১৩ ক্লাব ভবনে উদ্বোধন করা হয়। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন ক্লাবের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক মোঃ হানিফ হাওলাদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীরা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ অফিস

এসএমই ঋণের পর্যালোচনামূলক ১ম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এসএমই ঋণের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনামূলক ১ম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক আবদুল হামিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এসএমই'র দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে ইতোমধ্যে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এসএমই'র মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির শিখরে উন্নীত হচ্ছে। সমাজের বৃহত্তম অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া আমাদের সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জন যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এক্ষেত্রে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুখ্য ও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

সভায় ত্রৈমাসিক বিবরণীর ওপর পর্যালোচনামূলক ব্যাংকভিত্তিক আলোকপাত করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ও কৃষি ঋণ এবং আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও উপ মহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান এবং গোলাম মোস্তফা ও যুগ্ম পরিচালক স্বপন কুমার চৌধুরী। তারা উল্লেখ করেন যে, বেশিরভাগ ব্যাংক কর্তৃক সেবা ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ঋণ বিতরণ করা হয় না বরং চলতি ব্যবসা খাতে সিংহভাগ অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি কয়েকটি ব্যাংকে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং কয়েকটি ব্যাংকে মোটেও নারী উদ্যোক্তা নেই। তাই নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ এবং প্রতিটি শাখা কর্তৃক প্রতি মাসে কমপক্ষে একজন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও সভায় এসএমই সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণমানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সহজে ও স্বল্প সময়ে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে লক্ষ্যমাত্রার ৪০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে বিতরণ; পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল (Business Strategy) অবলম্বন, বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই, আদায় ও অন্যান্য বিষয়ে তদারকি জোরদার করা, নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ, ঋণ প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজ করতে ঋণ দলিলাদি সম্পাদন সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়।

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের কনফারেন্স হলে ১৯ আগস্ট ২০১৩ ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক মাকসুদা বেগম। প্রধান অতিথি সেমিনারে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমের উদ্দেশ্য এবং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ

সেমিনারে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনারে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৪০টি ব্যাংকের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য সেমিনারের রির্সোস পারসন ছিলেন উপ মহাব্যবস্থাপক মাকসুদা বেগম এবং উপ পরিচালক মোঃ তাজরুল ইসলাম।

জাতীয় শোকদিবসে আলোচনা সভা

১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ৩৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে ঐদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল সংগঠন ও ব্যাংক প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং জাতীয় পতাকা ও কমান্ডের পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। পরে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আলোচনা সভা

সভায় প্রধান অতিথি নির্মল চন্দ্র ভক্ত জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। এ ছাড়াও অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজল আহমদের বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। আলোচনা সভা শেষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে ২৬ আগস্ট ২০১৩ সিলেট অফিসের আওতাধীন সব তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিক কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। তিনি শস্য এবং ফসল খাতে ও আমদানি বিকল্প ফসল খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতে এবং নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে এসএমই ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে ব্যাংক প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব আরোপপূর্বক ঋণ মনিটরিং ও আদায় কার্যক্রম জোরদার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ঋণের সঠিক বিবরণী যথাসময়ে দাখিলের জন্য ব্যাংক প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন। সভায় ব্যাংকওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, ঋণ বিতরণ ও আদার হার ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সভায় কৃষি ঋণ ও এসএমইএসপিডি বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেটের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। প্রধান অতিথি তার উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনে

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক আঞ্চলিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ

উপস্থিত ব্যাংকের বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক প্রধানদের ব্যাংক শাখা পর্যায়ে লেনদেন মনিটরিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। বিএফআইইউ'র উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সিলেট অঞ্চলে কার্যরত ব্যাংকসমূহের বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক প্রধান ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এর আগে সিলেট অফিসে ৩১ আগস্ট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআইইউ'র উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। উপ মহাব্যবস্থাপক জুলফিকার মসুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ মহাব্যবস্থাপক কাজী ইকবাল ইমাম, মোঃ আব্দুল বারী ও কাজী রফিকুল হাসান। কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএফআইইউ'র উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক মোঃ মামুন হোসেন ও মোঃ মোহসীন হোছাইনী। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিস ও তফসিলি ব্যাংকসমূহের মোট ৪৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংক ক্লাবের অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের ২০১৩-২০১৪ এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক, ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে

ব্যাংক ক্লাব, সিলেট এর নবনির্বাচিত সদস্যবৃন্দের সাথে মহাব্যবস্থাপক

প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। প্রধান অতিথি নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বিগত পরিষদের সভাপতি মুহম্মদ নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ মহাব্যবস্থাপক জুলফিকার মসুদ চৌধুরী, কাজী ইকবাল ইমাম, ড. মোঃ কবির আহাম্মদ, কাজী রফিকুল হাসান ও শান্তনু কুমার রায়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন মোঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী - সভাপতি, মোঃ আশক আলী - সহ সভাপতি, বিপ্লব চন্দ্র দত্ত - সাধারণ সম্পাদক, কাজী করিমুজ্জামান- সহ সাধারণ সম্পাদক, মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী - কোষাধ্যক্ষ, মোঃ গিয়াস উদ্দিন - দপ্তর সম্পাদক, মোঃ ওয়ারিছ উদ্দিন- ক্রীড়া সম্পাদক (বহিঃ), মোঃ বাবুল আক্তার - ক্রীড়া সম্পাদক (অভ্যঃ), মোহাম্মদ আলী আক্তার - সাহিত্য সম্পাদক, জ্যোতির্ময় রায়- সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং মোঃ বদরুদ্দোহা, সতীশ চন্দ্র দাস, অমর চন্দ্র দেব, মোঃ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী ও মোঃ ইদ্রিস মিয়া - সদস্য।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গৃহায়ন তহবিল
একটি দরিদ্র বান্ধব প্রকল্প

মোঃ নাসিরুজ্জামান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহায়ন তহবিলের অর্থানুকূল্যে নির্মিত একটি গৃহ পরিদর্শন করছেন

বাসস্থান মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অভাবে অসংখ্য দরিদ্র লোক সীমাহীন কষ্টে কালাতিপাত করছে। অতীতে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী যেমনঃ বাঁশ, পাটশোলা, ছন ইত্যাদি পল্লি অঞ্চলে সহজলভ্য ছিল। বর্তমানে গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী একটি গৃহ নির্মাণের জন্য এককালীন মূলধনের ব্যবস্থা করা দরিদ্র জনগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু শহরের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকলেও পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের গৃহ নির্মাণের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ৫০.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে তহবিলের কার্যক্রম চালু করেন।

গৃহায়ন তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এর নেতৃত্বে একটি গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব, ভূমি সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব, সমাজকল্যাণ সচিব, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক এবং নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট সদস্য হিসেবে রয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান গৃহায়ন তহবিলের উপদেষ্টা এবং স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করছেন। গৃহয়ন তহবিলের ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট তার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর কর্মকর্তারা প্রেষণে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে কাজ করছেন।

পল্লি অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত সহজ শর্তে শতকরা ৬.০০ ভাগ হার সুদে ৩৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণের যোগান দেয়া হয়। ঋণের কিস্তি ফেরত প্রদানে ঋণ গ্রহীতাকে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আয়-বর্ধনকারী ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে এনজিও কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বাস্তবায়নকারী এনজিও'র নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ২২০-৩০০ বর্গফুটের দোচালা/চৌচালা/আরসিসি পিলার বিশিষ্ট ঘর ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ সুবিধা প্রদান করা হয়। গৃহ নির্মাণ ছাড়াও দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

যেভাবে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনজিও নির্বাচন করা হয়–

গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে যোগ্যতা ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচন করা হয়। গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশক্রমে এনজিও নির্বাচনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এনজিওদের নিকট থেকে প্রস্তাব আহবান করা হয়। এনজিওগুলোকে কোনো প্রকার জামানত রাখতে হয় না। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এনজিওদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ নিম্নোক্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই/বাছাই করা হয়–

- নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান হতে নিবন্ধন প্রাপ্তির পর অন্তত পক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা;
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হতে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইস্যুকৃত সনদপত্র;
- ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় তিন বছরের অভিজ্ঞতা;
- অন্তত ৪৫ জন নিয়মিত ও স্থায়ী কর্মকর্তা;
- মাঠ পর্যায়ে কমপক্ষে ২৭.০০ লক্ষ টাকার ঋণস্থিতি;
- মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায় হার অন্তত ৯০%;
- সংশ্লিষ্ট/নির্ধারিত উপজেলায় অফিসে থাকা বাধ্যতামূলক; এবং
- নির্ধারিত এলাকায় গৃহায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন আগ্রহ।

নির্ধারিত মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে এনজিওগুলোর বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখার পর চূড়ান্ত যোগ্য করা হয়। উক্ত তালিকা গৃহায়ন তহবিল স্টিয়ারিং কমিটির নিকট উপস্থাপনপূর্বক সংস্থাগুলোর অনুকূলে ঋণ বরাদ্দ দেয়া হয়। এরপর ঋণচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তিনটি কিস্তিতে ঋণ বিতরণ করা হয়।

গৃহায়ন তহবিলের আওতাধীন গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রমের ওপর একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে–

- অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীভুক্ত ঋণগ্রহীতা/সুবিধাভোগীদের ৭৩% মহিলা এবং ২৭% পুরুষ;
- ঋণগ্রহীতাদের ৯৫% বিবাহিত, ৩% বিধবা এবং ২% অবিবাহিত; ঋণগ্রহীতাদের ৪২% গৃহিণী, ১৪% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১২% দিন

মজুর, ১৮% ছাগল লালন-পালনকারী, ৯% পোলট্রি খামার, ৬% ক্ষুদ্র চাকরি, ৪% রিক্সা/ভ্যান চালক, ৩% ক্ষুদ্র কুটির এবং ২% মৎস্য চাষি;

- ঋণগ্রহীতাদের ৫৮% গ্রামীণ দরিদ্র, ৩৯% নিম্ন আয় শ্রেণিভুক্ত এবং ৩১% ভূমিহীন;
- ৯৭.৭% ঋণগ্রহীতার গড়ে ৮ শতক ভিটে মাটি আছে;
- ঋণগ্রহীতাদের গড় মাথাপিছু আয় মাসিক ৩৮৬৭ টাকা কিন্তু ৬৯% পরিবারের গড় মাসিক আয় ২৫০০-৪১৬৬ টাকার মধ্যে;
- ঋণ পেতে গড়ে সময় লেগেছে ২৪ দিন;
- ঋণগ্রহীতাদের ৯৭% টিউব ওয়েলের পানি পান করেন এবং ৮২%

আদিবাসীদের জন্য নির্মিত গৃহের সামনে একজন উপকারভোগী

সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহার করেন;

- ৮৩% ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ কিস্তি পরিশোধ করেন;
- ৬৩% এনজিও নিজেরা গৃহ নির্মাণ করে দেন এবং ৩৭% ঋণগ্রহীতারা গৃহ নির্মাণ করেন;
- ৬২% ঋণগ্রহীতা ঋণসীমাকে অপর্যাপ্ত এবং ৩৮% পর্যাপ্ত বলে মনে করেন;
- ৩৮% ঋণগ্রহীতা ঋণের সাথে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করেন যা তারা অন্য উৎস হতে সংগ্রহ করেন;
- ৮৮% ঋণগ্রহীতা নির্মিত গৃহ পেয়ে সন্তুষ্ট;
- ৮৯% ঋণগ্রহীতা গৃহের সঙ্গে লেট্রিন নির্মাণ করেন;
- ৯৮% ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা গৃহ নির্মাণ কাজে ব্যয় করেন; এবং
- ৪৩% লোক নদী ভাঙ্গনে, ৩২% লোক বন্যায় এবং ২৬% লোক সাইক্লোন/টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন হয়ে পড়ে।

গৃহায়ন তহবিলের ইতিবাচক প্রভাব-

- ৯৯% ঋণগ্রহীতা জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে;
- ৯৫% ঋণগ্রহীতার পারিবারিক জীবন নিরাপদ করেছে;
- ৪৫% ঋণগ্রহীতার সন্তানদের শিক্ষার মান বেড়েছে;
- ৬৭% ঋণগ্রহীতার স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ১১% ঋণগ্রহীতার নিরাপদ পানির সুবিধা হয়েছে; এবং
- ঋণগ্রহীতাদের সার্বিক সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গৃহায়ন তহবিলের পার্টনার হিসেবে মোট ৫১৩টি এনজিও দেশের ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গৃহায়ন তহবিলের আওতায় এ পর্যন্ত ৫৫,০০০ গৃহ নির্মিত হয়েছে যার বিপরীতে উপকারভোগী ২,৭৫,০০০ জন।

গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র পরিবারসমূহ ও অসহায় মহিলা শ্রমিকরা সুষ্ঠুভাবে সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস এবং নিজেদেরকে অধিকতর আয় বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারছে।

■ *লেখক: মহাব্যবস্থাপক ও ফাণ্ড ম্যানেজার, গৃহায়ন তহবিল*

... যাঁরা চলে গেলেন

মোঃ মনজুরুল হক-১
সাবেক জেডি (গভর্নর সচিবালয়)
জন্ম : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬
ব্যাংকে যোগদান : ২৭ জুন ১৯৭৮
মৃত্যু : ২৩ আগস্ট ২০১৩

আইলুস বাহার বুলবুল
সাবেক ডিডি (খুলনা অফিস)
জন্ম তারিখ : ২৫ জুলাই ১৯৬৮
ব্যাংকে যোগদান : ৩১ অক্টোবর ১৯৯১
মৃত্যু : ১২ আগস্ট ২০১৩

মোঃ মিজানুর রহমান পাটারী
সাবেক এডি (প্রধান কার্যালয়)
জন্ম : ১ জানুয়ারি ১৯৬৫
ব্যাংকে যোগদান : ১০ জানুয়ারি ১৯৯৩
মৃত্যু : ৩ আগস্ট ২০১৩

এ কে এম মিজানুর রহমান খান
সাবেক সিনিয়র কেয়ারটেকার
জন্ম : ১০ আগস্ট ১৯৫৭
ব্যাংকে যোগদান : ২২ মার্চ ১৯৭৯
মৃত্যু : ১ মে ২০১৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা সম্পর্কে আপনার লেখা ও মতামত আমাদের কাছে পাঠান। যে কোনো মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd

বর্তমানে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা কেমন চলছে?

দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সকল সূচক বেশ সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে জোরালো অবস্থা বজায় রয়েছে। বিগত চার অর্থবছরেই মোট দেশজ প্রবৃদ্ধি (GDP) শতকরা ৬ ভাগের ওপরে অর্জিত হয়। যদিও এ সময়ে বিশ্ব মন্দা ও প্রতিকূল অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির এ গতিধারা দেশের অর্থনীতির অভিঘাতসহনশীলতার (Resiliency) পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কিছু কিছু এশীয় ও আমাদের প্রতিবেশি দেশসমূহে বিশ্ব মন্দার প্রতিকূল বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতপক্ষে, অব্যাহত এ জোরালো প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতির in-built ক্ষমতার পরিচায়ক।

কৃষিখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আমাদের ব্যাংকিং খাত কৃষিতে পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তার মাধ্যমে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে (আমদানি বিকল্প কৃষি পণ্যের বিশেষ করে খাদ্য শস্য ও মসলাসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রতি অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষিত কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালার আলোকে কৃষি ও পল্লি খাতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের ঋণ বিতরণ, মনিটরিং ও আদায় কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকে তার deposit এর ন্যূনতম ২.৫% ঋণ হিসেবে কৃষিতে বিতরণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, যা অবশ্য প্রতিপালনীয়। খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) ৪ শতাংশ সুদহারে কৃষিঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। লবণ চাষিদেরকেও ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে area approach ভিত্তিতে অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপন্ন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যাংকসমূহকে কৃষি ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে NGO-Linkage এবং Bank to Bank Linkage পদ্ধতিতে কৃষি ঋণের বিতরণ দেশের সর্বত্র সমভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, একেবারে ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের কাছে জামানত বিহীন ঋণ পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ঋণ কর্মসূচি ব্র্যাকের দেশব্যাপী শাখা নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের কৃষি ও কৃষক বান্ধব নীতির ফলে ব্যাংকসমূহের কৃষিঋণ সেবা একদিকে দেশের অনগ্রসর ও উপেক্ষিত অঞ্চলসমূহে প্রসারিত হয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে, অন্যদিকে অঞ্চলভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত মজবুত হচ্ছে।

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংক

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের শিল্প খাত ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। বিগত চার বছরে এ খাতে শতকরা গড়ে প্রায় ৯ ভাগের কাছাকাছি গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
বাংলাদেশ ব্যাংক

শিল্প উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের শিল্প খাত ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। বিগত চার বছরে এ খাতে শতকরা গড়ে প্রায় ৯ ভাগের কাছাকাছি গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। যদিও বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং উপ-খাত শিল্পখাতের বড় অংশ তথাপিও বিগত বছরগুলোতে কার্যত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উপ-খাত উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ উপ-খাতে বিগত দুই অর্থবছরেই শতকরা ১০ ভাগের ওপর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামোসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়েছে, যা শিল্পখাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধিকে ভবিষ্যতে আরো ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি-নির্দেশনার আলোকে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন স্কীম ও কর্মসূচির আওতায় এসএমই খাতে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে আসছে, যা শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধিতে কার্যকরী অবদান রাখছে।

দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক খাতের অবস্থানকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের অব্যাহত দৃঢ় প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে। চলতি হিসাবের

ভারসাম্যও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, যা অর্থবছর ১৩-এ ২৫২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্তে উপনীত হয়। বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে FDI এর প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া, পোর্টফোলিও বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিনিয়োগও অব্যাহতভাবে কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, অর্থবছর ১৩ শেষে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৫১২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সম্প্রতি ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যা বর্তমানে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সার্বিকভাবে বৈদেশিক খাতের সূচকসমূহ দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থানকে প্রতিফলিত করছে। তবে বিগত দুই বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চলমান রাজনৈতিক আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারলে এ খাতের তেজিভাব আরো বৃদ্ধি পাবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিট্যান্সের ব্যাপক প্রবাহ অর্থনীতিতে কী রকম ভূমিকা রাখছে?

রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ বিগত চার বছরে গড়ে প্রায় ১১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ১৩ শেষে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে, যা জিডিপি'র প্রায় ১২ শতাংশ। রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম ৫/৬টি দেশের মধ্যে অবস্থান করছে। এ অব্যাহত জোরালো প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী ব্যবস্থা গ্রহণে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। যেমন: মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস চালু করা, ব্যাংকগুলোকে এনজিও লিংকেজ এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তবে রেমিট্যান্সের এ অন্তঃপ্রবাহের মূল অংশই আসে অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ প্রবাসী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ থেকে। এক্ষেত্রে সরকারি নীতি-নির্দেশনা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা বাস্তবায়ন সাপেক্ষে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি বিদেশে প্রেরণ করতে পারলে রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের গতি আরো বৃদ্ধি পাবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ধারণাটি কি? এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অর্থ হলো, প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রয়োজনে দেশের আপামর জনসাধারণের (শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী (শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলের) প্রবৃদ্ধির সুফল (আয়, কর্মসংস্থান, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ) ভোগ করতে পারে। আর এজন্যই প্রয়োজন অ-ব্যাংক (un-banked) জনগণকে ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাতে করে ব্যাংকের অর্থায়ন ও অন্যান্য আর্থিক সেবা সুবিধা নিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের উৎপাদন-ব্যবসা-কর্মসংস্থান স্বউদ্যোগে পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রাখছে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের কাছে ঋণ পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ঋণ কর্মসূচি এবং কৃষকদের জন্য ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক হিসাব খোলার উদ্যোগ নিয়েছে যার সংখ্যা ইতোমধ্যে ১ কোটিতে পৌঁছেছে। এ পর্যায়ে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য যে, আমাদের বর্তমান গর্ভনর ব্যক্তিগতভাবে এদিকটিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন যা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের এ প্রচেষ্টা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের দেশেও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে।

গ্রীন ব্যাংকিং কি? এর সুফল সম্পর্কে কিছু বলুন–

ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে অর্থায়ন বিশেষ করে কোনো উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসা খাতে বিনিয়োগে প্রদত্ত ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক ঐ সকল কর্মকাণ্ড পরিবেশ দূষণ করবে না এটা নিশ্চিত হয়েই অর্থায়ন করবে। এটাই গ্রীন ব্যাংকিং এর মূল ধারণা। এভাবে ব্যাংকের অর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণমুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে দেশের সার্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। এর দ্বারা দেশের বর্তমান জনসাধারণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উভয়েই সমভাবে লাভবান হবে। আর এজন্যই বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং তা পরিপালনে কঠোর নজরদারি রেখেছে।

দেশের ব্যাংকিং খাত কতটা অগ্রগতি লাভ করেছে?

২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ব্যাংকিং সেবার স্বাস্থ্যসূচক (CAMELS) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সূচকসমূহে ক্রমাগত উন্নতির ধারা সূচিত হয়। শক্তিশালী সামষ্টিক ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১২ সালে শতকরা ৩২.৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ব্যাংকই ব্যাসেল-২ সনদ অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (CAR) বজায় রেখে চলছে। তবে, ২০১২ সালের শেষার্ধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে loan classification and provisioning সংক্রান্ত regulation জারি করায় সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত সম্প্রতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে। তবে শীঘ্রই দক্ষতা ও গতিশীলতার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের এ সূচকে উন্নতি ঘটবে।

মুদ্রানীতির বাস্তবায়ন বা সাফল্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত করুন।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়া আর্থিক সঙ্কটের পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি ভঙ্গি গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সমুন্নত রাখার নিমিত্তে ঋণের পর্যাপ্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি চাপ সৃষ্টিকারী অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের ব্যবহার কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। বিগত চার বছরেই শতকরা ৬ ভাগের ওপরে টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য মূল্যস্ফীতি বর্তমানে সহনীয় পর্যায়ে (অর্থবছর ১৩ শেষে ৭.৭ ভাগ) রয়েছে। মূলত মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহের সঠিক ও সময়োচিত ব্যবহারে আর্থিক খাতে শৃংখলা বিরাজ করছে। তাছাড়া ২০১২-১৩ তে মুদ্রানীতির বিভিন্ন সূচকসমূহের (যেমন- ব্যাপক মুদ্রা (M2), রিজার্ভ মানি (RM), বেসরকারি খাতে ঋণ ইত্যাদি) ওপর প্রণীত লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত প্রবৃদ্ধির প্রায় কাছাকাছি অবস্থান সাম্প্রতিক সময়ে মুদ্রানীতির সঠিক প্রয়োগকে প্রতিফলিত করে।

বাংলাদেশে বর্তমানে মূল্যস্ফীতির ধারা কেমন?

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বর্তমানে বেশ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। অর্থবছর ১৩ শেষে বারো মাসের গড় ভিত্তিক মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৬.৮ শতাংশ, যা অর্থবছর ১২ শেষে ছিল ৮.৭ শতাংশ। অনুৎপাদনশীল খাতসমূহে ঋণ প্রদানকে নিরুৎসাহিত করে ব্যাংকসমূহকে কঠোর নীতিমালা অনুসরণের তাগিদ ও নির্দেশনা প্রদান এবং তা পরিপালন তদারক করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ সীমিত থাকে, যা মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়তা করে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের মূল্যের তুলনামূলক স্থিতিশীল অবস্থা এবং অর্থবছর ১৩ তে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যবৃদ্ধিও মূল্যস্ফীতি হ্রাসে কিছুটা অবদান রাখে। তবে, ঘন ঘন হরতাল ও আগামীতে পরবর্তী সরকার গঠনের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে অনিশ্চয়তার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় তা বিনিয়োগ চাহিদাকে কিছুটা শ্লথ করতে পারে এবং ব্যক্তিখাতের ঋণের চাহিদাকে প্রশমিত রাখার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

আগ্রা থেকে শান্তিনিকেতন

মনোজ কান্তি বৈরাগী

ঢাকা থেকে বিমানে মাত্র দু'ঘন্টা দশ মিনিটের পথ দিল্লী, সেখান থেকে এক্সপ্রেসওয়েতে আরও সাড়ে তিন ঘন্টা পেরিয়ে আগ্রা, তারপর পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের এক অবাক বিস্ময় 'তাজমহল' ! বাইশ হাজার মানুষের শ্রমে বাইশ বছরে নির্মিত সম্রাট শাহজাহানের অমর ভালবাসার অপূর্ব নিদর্শন, যার নির্মাণ শৈলী, স্থাপত্য, সৌন্দর্য, মোহনীয়-অবিস্মরণীয়।

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া'। এতো কাছে এতো অনিন্দ্য সুন্দর প্রদর্শনী থাকা সত্ত্বেও এতদিনে দেখা হয়নি! এবার সুযোগ হলো অফিসের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুবাদে। আকাশপথে দিল্লী যেতে নিচে তাকালে শ্বেতশুভ্র কাশবনের মতো 'হিমালয়' দেখা যায়। দিল্লী ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে পৌঁছে প্রথমেই বেরিয়ে পড়ি কুতুব মিনার দেখতে। ২৩৮ ফুট উঁচু এ মিনারটি পাঁচতলা বিশিষ্ট। এখান থেকে সমগ্র দিল্লী দেখা যেত কিন্তু এখন আর ওপরে ওঠা যায় না। প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেক এর আমলে এ মিনারটি তৈরি শুরু করা হয়, ইলতুতমিসের আমলে শেষ হয়। এ কমপ্লেক্সে কুয়াত উল ইসলাম মসজিদ, আয়রন পিলার, ইলতুতমিসের সমাধি এবং আলাই দরোজা দর্শনীয়। দিল্লীতে রয়েছে ১৬৩৮-১৬৪৮ সালে সম্রাট শাহজাহানের আমলে নির্মিত 'দিল্লী ফোর্ট', রয়েছে 'ইন্ডিয়া গেট' যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আত্মাহুতি দেয়া ভারতীয়দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত। এছাড়াও লোটাস টেম্পল, হনুমান মন্দির, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বাড়ি দর্শনীয়। তবে বিখ্যাত এসব মনুমেন্ট বিকাল পাঁচটার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি জানা না থাকলে সময় ও অর্থের অপচয় অনিবার্য।

পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় আগ্রার উদ্দেশে যাত্রা করি, ট্যুরিস্ট বাসে। সঙ্গে পর্যটনে ১৬ বছরের অভিজ্ঞ গাইড মি. উমেশ আমাদের যাত্রাপথে সকল স্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। মথুরা, বৃন্দাবন পেরিয়ে আগ্রা। আগ্রাতে তাজমহলকে সংক্ষেপে বলে 'তাজ'। এই 'তাজ' এর টিকেট কাউন্টার থেকে মূল চত্বর অনেকটা পথ, যেতে হয় 'তাজ' এর পরিবহনে করে। যাওয়ার পথে এক দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়– কখন দেখব 'তাজমহল'। এন্ট্রি চেকিং শেষে মূল ফটকে (দরজা-ই-রউজা) পৌঁছেই দূরে দেখা যাবে এতদিনের ছবিতে দেখা তাজমহল এর জীবন্ত হয়ে ওঠা; যা মনকে এক অব্যক্ত ভাবাবেগে আন্দোলিত করে।

পুরো তাজমহল চত্বরই সুশোভিত। ফটক থেকে মূল তাজ কিছুটা দূরে। মাঝপথে পরিখা ভর্তি টলমলে পানি। পাশে সারিবদ্ধ অরনামেন্টাল প্লান্ট। অপরপাশে যমুনা নদী। মূলত শ্বেত পাথরে গড়া তাজমহল, এর দেয়ালে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মূল্যবান পাথরের সৌকর্যমণ্ডিত অলংকরণ। এছাড়া রয়েছে ইসলামী স্থাপত্য, আরবি হরফে লেখা যা নিচ থেকে ওপরে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে উঠেছে যাতে দূর থেকে একই সমান দেখা যায়। মূল তাজে জুতা পায়ে ওঠা যায় না। টিকেট কেনার সময় সু-রেপার কিনে নিতে হয় পাঁচ রুপি দিয়ে, তা না হলে জুতা রাখা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়। উল্লেখ্য, প্রবেশমূল্য ভারতীয়দের জন্য বিশ রুপি হলেও বিদেশিদের জন্য পাঁচশ চল্লিশ রুপি। তবুও তাজমহলের অপার মহিমার তুলনায় এই প্রবেশমূল্য নগণ্যই মনে হয়। ভালবাসার এ নিদর্শনটি স্মৃতিময় করে রাখার জন্য পাথরের তৈরি রেপ্লিকা কিনতে পাওয়া যায়। গেটেও মিলবে, তবে আগ্রার মার্বেল এম্পোরিয়ামে মানসম্মত রেপ্লিকাসহ মার্বেল এর নানাবিধ সামগ্রী পাওয়া যায়। তাজমহলের গেটেই একটি রিসর্ট রয়েছে, যেখানে থেকে রাতের 'তাজ' কে উপভোগ করা যায়। এছাড়াও থাকার জন্য আগ্রাতে বিভিন্ন মানের হোটেল রয়েছে।

তাজমহলের পশ্চিম দিকে দেখা যায় লাল রংয়ের 'আগ্রা ফোর্ট'। প্রায় আড়াই কিলোমিটার ঘিরে উঁচু প্রাচীরঘেরা এই ফোর্ট, যার চারপাশে রয়েছে পানি ভর্তি পরিখা। ১৫৫৬-১৬০৫ সালে নির্মিত এই ফোর্ট থেকে সম্রাট শাহজাহান তার তৃতীয় স্ত্রী মমতাজ বেগমের স্মৃতিকে স্মরণ করে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

আগ্রা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সম্রাট আকবরের অপার এক কীর্তি ফতেহপুর সিক্রি। লাল পাথরের প্রায় ৬ কি.মি. দেয়ালবেষ্টিত এ অঞ্চলে ১৫৭১-১৫৮৫ সালে রাজধানী স্থাপন করা হয়েছিল। সম্রাট আকবর সকল ধর্মকে সমান প্রাধান্য দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তার তিনজন স্ত্রী ছিলেন তিন ধর্মাবলম্বী। তারা সকলেই তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করতেন। সম্রাট আকবর স্ত্রীদের পছন্দমতো অলংকরণ ও চাহিদামতো ভিন্ন আয়তনের মহল তৈরি করেছেন কিন্তু সব মহলের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সমান। ঐসব মহলে স্ত্রীদের ধর্মানুযায়ী উপাসনালয় তৈরি করে দিয়েছেন। সম্রাট আকবরের দেওয়ানী খাস এ আয়তাকার ভবনের মাঝখানে একমাত্র পিলারের ওপরে তিনি বসতেন এবং তার পারিষদবর্গ দেয়াল ঘিরে বসতেন। ঐ পিলারটি ছিল ধর্মীয় ঐক্যের প্রতীক। তার দুর্গে সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের 'অনুপ টালাও' নামে একটি মঞ্চ আছে। কথিত আছে তানসেনের সুরে কখনও বৃষ্টি ঝরতো, কখনো বা অগ্নি। তাই তার মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছে একটি পুকুরের ওপরে। দুর্গে ধর্মীয় বলয়ে রয়েছে সেলিম চিশতি'র শ্বেতপাথরের মাজারসহ অসংখ্য সমাধি এবং 'বুলান্দ দরোজা' নামে একটি সুউচ্চ গেট। এসব

ফতেহপুর সিক্রি

জওহরলাল নেহেরুর বাসভবন

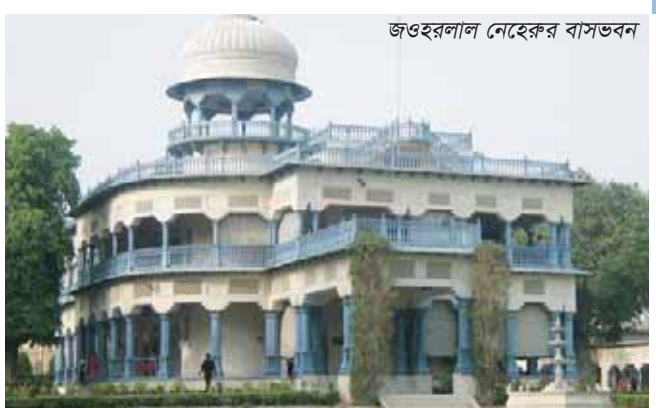

শান্তিনিকেতন

আগ্রা ফোর্ট

অনুপ টালাও

নিদর্শন যেমন শিল্পমণ্ডিত তেমনি ঐতিহাসিক হেরিটেজ সমৃদ্ধ যা বিশ্বপর্যটকদের আকর্ষণ করে।

ভুবনবিখ্যাত মমতাজমহল দেখে যেমন ভালবাসার জন্য প্রগাঢ় এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তেমনি সম্রাট আকবরের ফতেহপুর সিক্রি দেখলে ধর্মীয় অনুভূতি উদারতার মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পায়।

দিল্লী থেকে ফ্লাইটে দমদম নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এয়ারপোর্ট পৌঁছে কলকাতার সল্টলেকে 'ইনডিসমার্ট' হোটেলে উঠি। এই সল্টলেক হলো ১৯৭১ এর স্মৃতি বিজড়িত আমার শরণার্থী জীবনের 'লবণ হ্রদ' ক্যাম্প। এখানে থেকে কোর ব্যাংকিং এর ওপর টিসিএস (টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস) এর আয়োজনে প্রশিক্ষণ নেই। তারপর আবার বেরিয়ে যাই উড়িষ্যা প্রদেশের 'পুরী'র উদ্দেশে; হাওড়া থেকে দুরন্ত ট্রেনে। এসব ট্রেনের রিজার্ভেশন আগেই করে নিতে হয়। শীতাতপ চেয়ারের ভাড়া আপ-ডাউন একহাজার চারশ রুপি। এর মধ্যে কমপ্লিমেন্টারী হরেক রকমের উন্নত খাবার পরিবেশন করে। আট ঘন্টার জার্নি। তারপর ভারতের সুন্দরতম সমুদ্র সৈকতের গর্জন, ফেনিল উত্তাল তরঙ্গরাশি আর তীরে রয়েছে ধর্মীয় অনেক পুরাকীর্তি। এর মধ্যে জগন্নাথ দেবের মন্দির, গৌতম বুদ্ধের ধবলগিরি, যার পাশেই বহমান নদীতে রাজা অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল; এখান থেকেই গৌতম বুদ্ধের অহিংস ধর্মের সূচনা হয়েছিল বলে কথিত আছে। আরও আছে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়, এই খণ্ডগিরির চূড়ায় রয়েছে 'জৈন মন্দির'। এ দু'টি পাহাড়ে উঠতে পথে হনুমান এর দল লম্বা লেজ মেলে খাবারের বায়না ধরে। এজন্য বাদাম কিনে নিয়ে যেতে হয়, ওরা হাত পেতে নেয়, মজা করে খায় আর পর্যটকেরা তৃপ্তি পায়।

এছাড়া ভুবনেশ্বরে কোনার্কে সূর্যদেবের মন্দির ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই সূর্য মন্দির এমন বিজ্ঞান সম্মতভাবে নির্মিত যে, এর দেয়ালে খচিত চব্বিশটি চাকার ওপর পর্যবসিত সূর্যের আলো থেকে প্রাচীনকালে সময় নির্ধারণ করা হতো। কোনার্ক থেকে মেরিন ড্রাইভে পুরীতে ফেরা আর এক মনোরম অনুভূতি। রাস্তার একধারে ঝাউবন ও সমুদ্র, অন্যপাশে কাজু বাদামের বন আর প্রচুর হরিণের বসতি। আমরাও থেকেছি মেরিন ড্রাইভের একটি হোটেলে যেখান থেকে সমুদ্রের ফেনিল ঢেউ ও গর্জন উপভোগ করা যেত। পুরীর সমুদ্র সৈকত এবং ধর্মীয় পুরাকীর্তির সৃষ্টি শৈলী যেমন পর্যটকদের আকর্ষণ করে তেমনি সৈকতের বিপনী বিতানের সম্বলপুরী চাদর এবং কটকি শাড়িও আকর্ষণীয়।

'পুরী' থেকে ফিরেই 'শান্তিনিকেতন' এর উদ্দেশে যাত্রা করি। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তার নিজের হাতে গড়া শান্তিনিকেতনের প্রতিও ছিল আমার দুর্নিবার আকর্ষণ। হাওড়া থেকে ট্রেনে বোলপুর স্টেশনে কিংবা শান্তিনিকেতন এর জন্য নির্ধারিত 'প্রান্তিক' নামক স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে পনের মিনিটের পথ পেরিয়ে শান্তিনিকেতন। পর্যটকদের জন্য রয়েছে হোটেল/মোটেল। বীরভূম জেলার বোলপুর থানার শ্যামবাটি নামক স্থানে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল ভুবনডাঙ্গা। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ জায়গায় শান্তির পরশ পেয়ে এর নামকরণ করেন শান্তিনিকেতন। শান্তিনিকেতন সত্যিই শান্তির পরশকেন্দ্র, সবুজ ছায়া বীথিঘন নির্মল প্রান্তর, যেখানে রয়েছে প্রখ্যাত 'ছাতিমতলা' আর আম্রকাননের সমাবেশ। আর এইসব তরুতলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। প্রকৃতির সাথে শিক্ষা, তাই ওখানকার শিক্ষার্থীরাও যেন হয়ে যায় প্রকৃতির মতো উদার। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, সত্যজিৎ রায় এবং নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন এখানে অধ্যয়ন করেছেন। অমর্ত্য সেন এর শান্তিনিকেতনে বাসভবন রয়েছে।

শান্তিনিকেতন মূলত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; যেখানে আর্টস, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা সহ বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের নানা বিষয়ে অধ্যয়নের, এমন কি চীনা ও জাপানি ভাষা শিক্ষারও সুযোগ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীনিকেতনে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ। রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের নাম 'উত্তরায়ণ' যেখানে উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ এবং উদীচী নামের ভবনে বিভিন্ন ঋতুতে পছন্দমতো তিনি বাস করতেন এবং শিল্প ও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন হতেন। বিশ্বের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এখানে এসেছেন বলে নিদর্শন রয়েছে। এখানে রয়েছে শিমুল তরু যেটি তিনি নিজের হাতে পরিচর্যা করতেন। একই চত্বরে মিউজিয়ামে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অনেক স্মৃতি ও ব্যবহার্য হরেক সামগ্রী। দর্শনীর (দশ রুপি) বিনিময়ে এখানে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ক্যামেরা সঙ্গে নেয়া যায় না বলে ছবি ধারণ করা যায় না, শুধু মনের গহীনে অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে ফিরে আসতে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রকম ছবি কিনতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত পিপাসুদের জন্য রয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি। এছাড়া শান্তিনিকেতনে পাওয়া যায় নয়নকাড়া কাঁথা স্টীচের শাড়ি ও অন্যান্য নকশী বস্ত্র। শান্তিনিকেতনের মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি যেমন মনকে উদাস করে, প্রফুল্ল করে, তেমনি পরিবেশ ও চিত্তকে বিকশিত করে, অনাবিল প্রশান্তি দেয়। আমাদের ব্যস্ত জীবনে কর্মে উদ্যোম ফিরে পেতে এমন প্রশান্তি একান্ত প্রয়োজন।

■ *লেখক: উপ মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিস*

কুতুব মিনার

রেডফোর্ট, দিল্লী

লোটাস টেম্পল

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক সম্মেলন

বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের ২০১৩ সালের সম্মেলন ২৩ ও ২৪ আগস্ট ২০১৩ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং বিএফআইইউ এর মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড দেবপ্রসাদ দেবনাথ। নির্বাহী পরিচালক এবং বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান ম. মাহফুজুর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে কার্যরত ৫৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান ও উপ-প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা, বিভিন্ন ব্যাংকের কক্সবাজার জেলার আঞ্চলিক প্রধানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান তার বক্তব্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ করে ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করার বিষয়ে তিনি ব্যাংকগুলোকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। অপরাধলব্ধ অর্থ ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থায় যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও গভর্নর ব্যাংকগুলোর প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের অবস্থান বর্ণনা করেন।

ম. মাহফুজুর রহমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার আহবান জানান। সম্মেলনে ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার, দি সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক মইনুদ্দিন এবং ব্যাংক এশিয়া লিঃ এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুল ইসলাম মানি লন্ডারিং ও টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে বিএফআইইউ এর সহযোগিতা কামনা করেন।

দুইদিনব্যাপী সম্মেলনে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাতটি পেপার উপস্থাপিত হয়।

আধুনিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিক ও বৃহৎ পরিসরে নির্মিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক শুভংকর সাহা, মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুর রহিমসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের উদ্বোধনকালে গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি একটি মডেল শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র হবে। আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা, শিক্ষার উপকরণ এখানে থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে মহিলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা কর্মকর্তারা বাচ্চাকে শিশু দিবাযত্ন

শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশুদের সাথে গভর্নর

কেন্দ্রে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারবেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র চালু হয়। বর্তমানে এ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসর বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রায় ৬০ জন শিশুকে আদর্শরূপে পরিচর্যা, বিনোদন, খেলাধুলা এবং সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রটি ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

শুরু থেকেই 'সেবা নারী ও শিশুকল্যাণ' নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে এ শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে আসছে। এখানে ৬ মাস থেকে অনূর্ধ্ব ৮ বছর বয়সী শিশুদের অফিস সময়ে লালন-পালন ও পরিচর্যা করা হয়। বর্তমানে এখানে ৩৪ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা নারী শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের ১ জন তত্ত্বাবধায়ক, ৩ জন পরিচর্যাকারী-শিক্ষক, ৬ জন আয়া ও অন্য লোকবলের মাধ্যমে শিশুদের পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য বুয়েট আয়োজিত Network switching, Routing and Security শীর্ষক দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৩০ এপ্রিল ২০১৩ সমাপ্ত হয়। ১ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স হলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করেন।

শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশন আজ বিদেশে যেমন প্রশংসিত হচ্ছে তেমনি সারা দেশের অন্যান্য এলাকায় বন্য প্রাণী সেবা, সবুজ শ্যামল পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম, নদ-নদী, খাল বিল, স্বচ্ছ জলাধার, চাষের জমি, প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখার উদ্যোগে সবাই যেন এগিয়ে আসে।
– গভর্নর

বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের জন্য অনুদান গ্রহণ করছেন গভর্নর

শ্রীমঙ্গলে বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশন

ব্যাংকারদের অনন্য সিএসআর

সিদ্দিকুর রহমান সুমন

দিগন্তজোড়া চা-বাগান আর লাউয়াছড়া বনভূমির পাশাপাশি চায়ের দেশ শ্রীমঙ্গলে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সীতেশ রঞ্জন দেবের চিড়িয়াখানা। যার আরেক নাম 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশন'। নাম যা-ই হোক এখনও সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানা হিসেবেই ফাউন্ডেশনকে সবাই চিনেন। একজন দুর্ধর্ষ শিকারি থেকে সীতেশ রঞ্জন দেব এখন দেশের অন্যতম বন্যপ্রাণী সেবক। ১৯৯১ সালে শ্রীমঙ্গলের এক টিলাময় বনে ভালুকের কবলে পড়ে শিকারি সীতেশ বাবু মুহূর্তেই তার ডান চোখ ও নাক হারিয়ে গুরুতর জখম হন। তবে দানশীল কয়েকজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উন্নত চিকিৎসায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি। সেই থেকে বন্য পশু-পাখির প্রতি পরম মায়া-মমতার নিদর্শন হিসেবে গড়ে তুলেছেন বন্যপ্রাণী সেবাশ্রম। তবে সেবাশ্রমে আশ্রয় নেয়া প্রাণীগুলোর খাবার ও চিকিৎসার খরচ সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতে হতো আশ্রয়দাতাকে। অনেক সময় নিজের প্রিয় কোন জিনিস বিক্রি করে প্রাণীগুলোর জন্য খাবার ক্রয় করতে হতো তাকে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সেবা ফাউন্ডেশনের জন্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিতভাবে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সাহায্যের কারণে এখন প্রাণ ফিরে পেয়েছে সেবা ফাউন্ডেশনটি।

শ্রীমঙ্গলসহ এর আশপাশের এলাকায় বনের প্রাণীরা খাদ্যের অন্বেষণে প্রায়ই লোকালয়ে বেরিয়ে এলে জনসাধারণ তাদের আটকে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে পিটিয়ে জখম করে। সেসব আহত বন্যপ্রাণী সংগ্রহ করে এখানে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা দেয়া হচ্ছে। তারপর আবার সেই প্রাণীগুলোকে বনে ছেড়ে দেয়া হয়। সীতেশ রঞ্জন দেবের বাগানবাড়িতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি জানান, প্রকৃতি ও প্রাণীপ্রেমী গভর্নরের আন্তরিক প্রয়াসে অনেকটাই প্রাণ ফিরে পেয়েছে বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশন। ড. আতিউর রহমান তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রথমে পুরস্কারের ১ লাখ টাকা অনুদান দেন। তার আহ্বানে ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে দেশের বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। রবির উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে বাউন্ডারী দেয়াল। গত বছরের ২০ অক্টোবর ফাউন্ডেশন চত্বরে প্রায় ২২টি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ৪০ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট এবং প্রাণীদের আনা- নেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ ভ্যান আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় সীতেশ বাবুর হাতে। এছাড়াও ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্যোগে দেয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা ও ৬টি খাঁচা। শেলটেক দিয়েছে ২ লক্ষ টাকার অনুদান। নিটল-টাটা গ্রুপ ২০ হাজার টাকার মাধ্যমে দাঁড়িয়েছে সীতেশ বাবুর পাশে। শুধু গভর্নর হিসেবে নয়, গভর্নর পদে আসীন হবার অনেক আগে থেকেই

(১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানায় আশ্রিত ও পালিত বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি

লিফটগুলো ভালো তবে বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্লোর লেভেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিফটগুলো থামলে আরো ভালো হতো।

মোঃ রাকিব হাসান
লিফটম্যান
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

ম্যাডাম, নামবেন না? এ প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। লিফটের মধ্যে সহকর্মীর সাথে আলাপ করতে করতে কখন নিজের ফ্লোরে চলে এসেছি খেয়ালই ছিল না। নামার কোন লক্ষণ না দেখে এ প্রশ্ন। লিফটম্যান ঠিকই মনে রেখেছে আমি কোন্ ফ্লোরে বসি। এভাবে প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ দর্শনার্থীদের বিভিন্ন ফ্লোরে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে লিফটম্যানরা। এই লিফটম্যানদের একজন মোঃ রাকিব হাসান, বয়স ৩০। শান্ত, নম্র, ভদ্র গোছের রাকিব প্রায় আট/নয় মাস ধরে এই চাকরি করছে। লিফটের ভিতর টানা কয়েক ঘন্টা উঠা নামায় প্রথমদিকে সামান্য অসুস্থতাবোধ করলেও পরে আর কোন সমস্যা হয়নি তার। আর লিফট চালানো বেশ সহজ এবং ছোট্ট একটি ট্রেনিং এর পরেই তাদেরকে লিফটম্যানের চাকরি দেয়া হয় বলে সে জানায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশ তার কাছে খুবই ভালো লাগে। এই কাজ করতে এসে কখনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়েনি। লিফটগুলোও ভালো তবে বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্লোর লেভেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিফটগুলো থামলে আরো ভালো হতো। লিফটম্যানদের শিফটিং ডিউটি থাকায় কাজটি খুব কষ্টসাধ্য নয়। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটিও পাওয়া যায়। রাকিব বাড়তি রোজগারের জন্য লিফটম্যানের চাকরির পাশাপাশি আরও একটি খণ্ডকালীন চাকরি করে। এভাবে একটু বেশি পরিশ্রম করে সামান্য স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছে সে।

রাকিব লিফটম্যানের চাকরি করবে এতটা আশা নিয়ে ঢাকায় আসেনি। অর্থোপার্জনের জন্য মাত্র ১৩ বছর বয়সেই টাঙ্গাইল থেকে প্রথমে সাভার পরে ঢাকায় আসে। মতিঝিলে হোটেল বয়ের কাজসহ নানা রকমের কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এত পরিশ্রমের মাঝেও পিতা মোঃ আব্দুল লতিফের কাছ থেকে পাওয়া গানের শখটি সে সযত্নে লালন করেছে। পরিবার ও বন্ধুদের মাঝে সীমাবদ্ধ এই শিল্পী পরিচয় তাকে আনন্দিত করে। একবার বন্ধুদের উৎসাহে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠিত গানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিচারকমণ্ডলীর কাছ থেকে সে বেশ প্রশংসাও পেয়েছে। ভাওয়াইয়া গানের প্রতি তার বেশ টান রয়েছে। শৈশবে টাঙ্গাইলের 'ধুমকেতু শিল্পী গোষ্ঠী'র সাথে সে যুক্ত ছিল। এখনও মাঝে মাঝে অবসরে বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসে। ছোট্ট এক শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে রাকিব সুখেই আছে।

■ *ফিচার : সাঈদা খানম, ডিজিএম, ডিসিপি*

শ্রীমঙ্গলে বন্যপ্রাণী

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

(উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান থাকাকালীন) এই চিড়িয়াখানার প্রতি ড.আতিউর রহমানের সুদৃষ্টি ছিল বলে জানান সীতেশ রঞ্জন।

সরেজমিনে দেখা গেছে বন্যপ্রাণী সেবাশ্রমে আছে বেশকিছু মায়া হরিণ, চিত্রা হরিণ, দুটি ভালুক, দুটি মেছোবাঘ, দুটি সোনালি বাঘ, একটি সাদা বাঘ, তিনটি অজগর। দুটি করে গুইসাপ, শঙ্খনি সাপ, লজ্জাবতী বানর, হনুমান, বাদামি বানর, বন মোরগ, সবুজ ঘুঘু, গন্ধগোকুল, পাম সিভিট বিরল প্রজাতির সাদা আলবিনো বাঘ, লামবার্ড, ঘুঘু, বানর, বন্য মথুরা, সরালী, কালেম, ময়না, বন্যমাছ, অজগর সাপ, মেলর্ড তিতির, সজারু, ইন্ডিয়ান সোনালি বানর, বন্য খরগোস, সাদা খরগোস প্রভৃতি প্রাণী রয়েছে। আরও আছে চারটি ধনেশ পাখি, পাঁচটি বনবিড়াল, উড়ন্ত কাঠবিড়ালীসহ প্রায় ৫০টি বন্যপ্রাণী। এছাড়া হরিয়াল, ঘুঘু, তোতা, সাইবেরিয়ান হাঁসসহ প্রায় ১৫০টি পাখি আছে। তার সেবাশ্রমের কাছের পুকুরে ভিড় করছে অতিথি পাখির ঝাঁক।

বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিতভাবে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সাহায্যের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে শ্রীমঙ্গল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশফাকুল হক চৌধুরী এ প্রতিবেদককে জানান, সিএসআর এর আওতায় ব্যাংকারদের সেবা ফাউন্ডেশনে সাহায্যের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়, বিশেষ করে গভর্নরের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে বন্য প্রাণী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। স্থানীয় সাংবাদিক সৈয়দ ছায়েদ আহমদ বলেন, গভর্নর ড. আতিউর রহমানের আন্তরিক উদ্যোগে সীতেশ বাবুর মিনি চিড়িয়াখানা বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশনে উন্নীত হয়েছে। গভর্নরের আন্তরিক প্রয়াসে অদূর ভবিষ্যতে এ ফাউন্ডেশন দেশ তথা এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম বন্য পশু প্রাণীর সেবা ফাউন্ডেশন হিসেবে পরিচিত লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর সচিবালয়ের মহাব্যবস্থাপক এ.এফ.এম. আসাদুজ্জামান জানান বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশনকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি দেয়ার জন্য গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সীতেশ বাবুর বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশনের জন্য ভবিষ্যতে সহায়তার হাত আরও প্রসারিত থাকবে। অভয়ারণ্য কেন্দ্র হিসেবে এটিকে গড়ে তুলতে সরকার, প্রশাসন, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বিত্তবান ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের ব্যক্তিগত ও ব্যাংকিং সেক্টরের সার্বিক সহযোগিতায় শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী ফাউন্ডেশন আজ বিদেশে যেমন প্রশংসিত হচ্ছে তেমনি সারা দেশের অন্যান্য এলাকায় বন্য প্রাণী সেবা, সবুজ শ্যামল পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম, নদ-নদী, খাল বিল, স্বচ্ছ জলাধার, চাষের জমি, প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখার উদ্যোগে সবাই যেন এগিয়ে আসে তেমনটি আশা গভর্নর ড.আতিউর রহমানের।

প্রতিবেদক ঃ গভর্নর সচিবালয়, প্রটোকল উপ বিভাগে কর্মরত

অন্তর্জগৎ

কামরুজ্জামান চৌধুরী

> *মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অভ্যাস ও চর্চাই হচ্ছে আসল। পজিটিভ চিন্তা থাকা দরকার, তাহলেই নেগেটিভ বিষয়গুলো আস্তে আস্তে দূর করা অসম্ভব কিছু নয়।*

মন নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। মন সম্পর্কে ধারণা থাকলে, তা নিয়ন্ত্রণ করাও সাধ্যের মধ্যে থাকে। জেনে রাখা দরকার যে, মন সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে, দেহের প্রয়োজনে এবং নতুন অভিজ্ঞতা আর পূর্ব জমা অভিজ্ঞতার আলোকে। অনেক সময় দেখা যায় মাথায় আঘাতজনিত কারণে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে আবার পুনরায় আঘাত পেয়ে স্মৃতি শক্তি ফিরে আসে। এতে প্রমাণিত হয় মস্তিষ্ক কোষে তথ্য ঠিকই জমা ছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের যে সব কোষ তথ্য আদান-প্রদানে নিয়োজিত তা ঠিক জায়গামত ছিল না বিধায় সে তথ্য দিতে পারছিল না। তাই পুনরায় আঘাত পেয়ে অর্থাৎ জোরে ঝাঁকুনি খেয়ে তথ্য আদান-প্রদানের কোষগুলো জায়গামতো ফিরে আসার পরে আগের জমা তথ্য দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আঘাতজনিত কারণে কোষগুলো যদি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় তবে আর স্মরণশক্তি ফিরে পাবার প্রশ্ন থাকে না। সেজন্যই মস্তিষ্ক দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যারা মন নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাদের ধারণা, মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায় মনকে সম্মোহন করে। নিজেকে প্রভাবিত করে অটো সাজেশনের মাধ্যমে অনেক উপকার পাওয়া সম্ভব।

আমাদের মস্তিষ্কে স্পষ্টতই দুটি অংশ আছে– বাম ও ডান। বাম অংশ দিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ করি। জাগতিক উন্নতির জন্যে এর প্রচুর চর্চা হয়েছে। কিন্তু ডান অংশটার তেমন চর্চা হয়নি। এই অংশে আমাদের অবচেতন মনের বাস। অবচেতন মন হচ্ছে প্রতিটি মানুষের ভিতরে বসানো এক একটি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী কম্পিউটার বিশেষ। এই কম্পিউটারের অনেক জ্ঞান, অনেক ক্ষমতা। সঠিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করলে এর সাহায্যে আরও বড়, আরও ক্ষমতাশীল এক মহা-কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

অবচেতন মনের সাহায্যে এই মহা-কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের চাহিদা প্রদান করি। এর মাধ্যমে সাফল্য, সমৃদ্ধি, সমস্যার সমাধান, সুখ অর্জন করা যায়। তিন হাজার নিউরন আছে আমাদের মস্তিষ্কে। প্রতিটি নিউরন কয়েকটি অ্যাটমের সমষ্টি, কম্পিউটারের কমপোনেন্টের মত কাজ করছে আমাদের মস্তিষ্কে। আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা যে কোন কম্পিউটারের চেয়ে বহুগুণ বেশি। যদি উভয় মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায় তাহলে আমাদের পক্ষে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

নেতিবাচক ভাবাবেগ আমাদের ডান মস্তিষ্ক চালনায় এবং হায়ার ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে যোগাযোগে বাধা দেয়, মনটাকে শান্ত শিথিল হতে দেয় না। কতগুলো নেতিবাচক ভাবাবেগের মধ্যে আছে:

ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্ষোভ, সন্দেহ, প্রতিশোধ, অপছন্দ, নৈরাশ্য, অভিযোগ, পরিত্যক্ত-বোধ, তিক্ততা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এসমস্ত ভাবাবেগকে একটা ভাবাবেগ দিয়ে প্রতিহত করা যায় সেটা হলো- ভালবাসা।

মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া সহজ। কল্পনা আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত কার্যকরী বিষয়। এ থেকে উপকার পাবার কোনো শেষ সীমা নেই। আমরা যদি বিশ্বাস, বাসনা আর প্রত্যাশা দিয়ে কল্পনাকে উজ্জীবিত করতে পারি, এবং উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য চাক্ষুষ করার কাজে এমনভাবে ব্যবহার করতে পারি, যার ফলে উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যগুলো আমরা দেখতে, অনুভব করতে, শুনতে, স্বাদ নিতে এবং এমন কি প্রায় ছুঁতে পারবো, তাহলে জীবনের কাছ থেকে কিছু চেয়ে আমাদের কখনো নিরাশ হতে হবে না। ইচ্ছাশক্তি আর কল্পনার মধ্যে বিরোধ বাধলে কল্পনাই সব সময় জেতে- বিশেষজ্ঞদের এটাই মত।

যদি ক্ষতিকর বদভ্যাস ত্যাগ করতে চাই আমরা, তাহলে নিজের সাথে নিজের প্রতারণা বাদ দিতে হবে। সত্যি যদি ওটা ছাড়তে চাই, আপনা আপনি ছেড়ে যাবে ওটা। আমাদের আসলে বুঝার চেষ্টা করা উচিত বদভ্যাসটা ছাড়লে কি লাভ হবে? এই লাভটা পাবার জন্য যখন অস্থির হয়ে উঠব তখন ছাড়তে পারব ক্ষতিকর অভ্যাস। লাভ পাবার জন্যে অস্থির হওয়া, এটা একটা শেখার বিষয়। লাভ পাবার জন্যে কিভাবে অস্থির হতে শিখতে হয় তা জানা যাবে আমাদের অবাঞ্ছিত অভ্যাস ছেড়ে দিলে তখন আর সমস্যা হবে না। খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে বেশি চিন্তা করা, ছেড়ে দেব বলে বার বার প্রতিজ্ঞা করা, এতে অনেক সময় ফল উল্টো হয়, অভ্যাসটা আরো শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে আমাদের। ব্যাপারটা অনেকটা ঘুম আনার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠার মতো, যতোই আমরা অস্থির হবো ততোই আমরা জেগে থাকবো, ঘুম আসতে চাইবে না।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অভ্যাস ও চর্চাই হচ্ছে আসল। পজিটিভ চিন্তা থাকা দরকার, তাহলেই নেগেটিভ বিষয়গুলো আস্তে আস্তে দূর করা অসম্ভব কিছু নয়।

■ *লেখক : উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)*
সিএসডি-২, প্রধান কার্যালয়

বিব্রত করো না সুনন্দা তুমি

মল্লিক হাবিবুল্লাহ

আমাকে বিব্রত করো না সুনন্দা তুমি, বার বার
আমার মগজে ঢেলে, সেই সব পুরনো কাসুন্দি
তোমার (হোক তা যতই মধুর) লাভ নেই কোনো।
আমার তো জানাই আছে, তোমার সে বিত্ত-বেসাত
জোড়ায় জোড়ায় হালের বলদ, দিগন্ত বিস্তৃত
মাঠ, শস্যের সম্ভার; তোমার উর্বর ভূমি– যার
পরতে পরতে পলির পলস্তারা। আমাকো করো
না বিব্রত সুনন্দা তুমি, এসব তীব্র প্রলোভনে।

তুমি তো জানোই ভালো, আমার পায়ের নিচে সদা
থরো থরো কম্পমান মৃত্তিকা কেবল। আতঙ্কিত
পদে কেবলি ভয়ার্ত পদক্ষেপ। তোমার অজানা
তো নয় কোনো, হাল-সাকিন; আমার চাল-চুলোর
তাবৎ বিসম্বাদ। আমাকে বিব্রত আর করো না
সুনন্দা তুমি, আমাকে থাকতে দাও, আমার মতো।

শেষ বর্ষা

অচিন্ত্য দাস

বাতাসের গায় পথ খুঁজে যায় ঠিকানা কোথায় পাবে সে
শেকড়ের টান ঘিরে অভিমান পাতা উড়ে যায় আকাশে।

আকাশের পথ মেঘেদের রথ ডানা মেলে দেয় হাওয়া
বাতাসের দিন ঠিকানাবিহীন শুধু উড়ে উড়ে যাওয়া
বুকে জমে তোর স্মৃতিজল ঝরঝর ধারা টলমল
বুড়ো মর্মর শুকনো পাতা ভিজে ভিজে যায় বাতাসে।

হঠাৎ ঠিকানা মাটির বিছানা ফিরতেই হয় শেষে
মায়াবী আদর ঘুমের চাদর জড়ানো অচিন দেশে
ভাল থেকো মেঘ 'মেঘদল' বুকে নিয়ে কাল স্মৃতিজল
অবগাহনের শেষ কবিতা মেশে বর্ষার সুবাসে।
মূল : উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস (উইলো পোয়েম)

সন্ধান

খন্দকার মমতাজ হাসান

উত্তর দক্ষিণ ঈশান নৈঋত
সবদিকেই করেছি এর সন্ধান
ধরা দিল না সে আমাতে
খুঁজেছি কি আমি তারে?
সব লোকেই চিরন্তন খোঁজে।
পায় না কেহ সন্ধান
শুধু ভ্রমের আলাপ-বিলাপন।
তারপর যা পায় সদা,
স্রষ্টার অসীমে লীন হতে.....
তবু করে প্রেমের সন্ধান ॥

কম্পিউটার

মোঃ আজাহারুল ইসলাম

কম্পিউটার, কম্পিউটার কিসের তোমার অহংকার?
লোহা-লক্কড় যন্ত্রপাতি, শুধুই তোমার হার্ডওয়্যার।
লিখতে পারো শুনতে পারো, স্মরণ রাখো কতকি?
প্রোগ্রাম দিলে নড়োচড়ো, বুঝেছি তোমার চালাকি।
সিপিইউ প্রিন্টার কীবোর্ড আর মনিটর,
এসব নিয়ে শরীর তোমার, পড়ে থাক দিনভর।
বোকা তুমি, নিজে কিছু করার নেই শক্তি–
সফট্ওয়্যার ছাড়া মৃত, বিজ্ঞজনের উক্তি।
'অন' করলে আড়মোড়া দাও, প্রোগ্রাম পেলে জাগো,
'কমান্ড' দিলে রেসপন্ড কর, বিদ্যুৎ গেলে ভাগো।
'মেমোরী চিপ' মগজ তোমার, 'ইনপুট' দিলে ধরো,
ডাটা পেলে, এন্ট্রি দিলে, ডিস্ক-এ জমা করো।
পেলে কিছু দিতে পারো; নইলে কিছুই না,
সবাই তোমায় যন্ত্র বলে, আমিও বলি হ্যাঁ।
'কীবোর্ডে' মানুষ যখন, চাপে তোমার 'কী'
আলোর ছলে মনিটরে, কর লেখালেখি।
'প্রিন্ট কী' তে চাপ দিলে কাগজেতে লেখ,
নিজের তোমার ক্ষমতা কি? এবার তুমি দেখ।
'কন্ট্রোল কী'তে চাপ দিলে, হও তুমি সোজা,
তোমার পেটে 'প্রোগ্রাম' দিয়ে করাই কাজের বোঝা।
মানুষ তোমায় বানিয়েছে, মানুষ তোমার গুরু,
তোমাকে আমার গোলাম বানানোর চেষ্টা করেছি শুরু।
তুমি একটা মেশিন মাত্র, এত বড়াই কিসে–
মানুষের কাছে তুচ্ছ তুমি, মানুষই সবার শীর্ষে।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

ইদানীং মানেই একাল

ইদানীংকাল লিখে ভোলানাথ বলে,
'এরকম শব্দ তো ব্যাকরণে চলে!'
পণ্ডিত শুনলেন, চোখ হল লাল
বললেন, 'ইদানীং মানেই একাল।
শুধু লেখো ইদানীং 'কাল'কে হটাও
এইবার পাততাড়ি সকলে গোটাও।'

['ইদানীং' শব্দটির অর্থ 'বর্তমানকাল' বা 'একাল'। অর্থাৎ 'ইদানীং'– এর মধ্যেই 'কাল' শব্দটি নিহিত রয়েছে। সুতরাং 'ইদানীংকাল' নয়, শুদ্ধ শব্দ 'ইদানীং'। ঠিক এরকম একটি ভুল প্রয়োগ 'সম্প্রতিকালে'। 'সম্প্রতি' শব্দের অর্থও 'ইদানীং' 'অধুনা', 'আজকাল'। সুতরাং 'সম্প্রতি' লেখাই যথেষ্ট, তার সঙ্গে 'কাল' যোগ করবার কোন দরকার নেই।]

বান্ধবী

সৈয়দ নূরুল আলম

ঘড়ির কাঁটা রাত এগারটা ছুঁই ছুঁই। এখনই তূর্ণা এক্সপ্রেস ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে ছুটবে। এখনও রমিজ এসে পৌঁছায়নি। রমিজকে না দেখতে পেয়ে ইকবাল ও জাভেদের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। শেষ মুহূর্তেও ওরা ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে এই বুঝি রমিজ দৌড়ে এসে ট্রেন ধরবে।

প্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজনের সময় কাজে না লাগলে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। ইকবালের ইচ্ছে হচ্ছে জানালা দিয়ে মোবাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে, খুঁজে আনুক রমিজকে। কে জানতো এই সময় মোবাইলে চার্জ থাকবে না। চার্জ থাকলে ফোন করে জেনে নেয়া যেত রমিজ এখন কোথায় আছে। কমলাপুর থেকে কতো দূরে আছে।

ইকবালের রাগটা এবার মোবাইল থেকে গড়িয়ে জাভেদের ওপর পড়ে। জাভেদের কাছে মোবাইল নেই। জাভেদের কথা, মোবাইল এখন খুবই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করছে, তাই ও ব্যবহার না করে অসাধারণ হতে চায়।

ইকবালের অবস্থা বুঝতে পেরে জাভেদ বলে, তোমার মোবাইলে চার্জ নেই তাতে কি, অন্যের মোবাইল ধার করে ফোন করো।

ইকবাল বলে, সে উপায় নেই। রমিজের নম্বর আমার মাথায় নেই, আমার পকেটেও নেই। ছিল মোবাইলে সেভ করা।

ইকবাল একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলে, রমিজও হয়তো আমাদের চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না।

মোবাইলটা আমাকে দাওতো, জাভেদ বলে।

কি করবে এই মরা ইঁদুর দিয়ে। এখন এটা মরা ইঁদুর ছাড়া আর কি? ইকবাল ক্ষোভের সাথে বলে, মোবাইলটা জাভেদের কাছে দেয়। জাভেদ মোবাইলটা শার্টের মধ্য দিয়ে বগলের নিচে রেখে চেপে ধরে।

ইকবাল অবাক হয়ে বলে, এটা কি ?

মোবাইলে চার্জ দিচ্ছি। জাভেদের এ কথায় ইকবাল হাসবে, না কাঁদবে বুঝতে পারে না।

ট্রেন ততক্ষণ খিলগাঁও ছেড়ে তেজগাঁও চলে এসেছে। ইকবালরা সেটা টের পায় নি। ইকবাল বুঝতে পেরে বলে, চলো নেমে পড়ি। রমিজকে রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া ও যদি কোন বিপদ পড়ে।

জাভেদ বলে, সবই ঠিক আছে কিন্তু এই চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবে ?

ইকবাল আর কথা বলে না। ধপাস করে নিজের সিটে বসে পড়ে।

ওরা সেন্টার সিট কেটেছে। মুখোমুখি বসে গল্প করতে করতে যাবে সে জন্য। সেন্টারে চারটা সিট। ওরা তিনজন ছাড়া, চতুর্থ সিটে মাঝারি বয়সের একজন ভদ্রলোক বসেছেন। লোকটিকে এতোক্ষণ ইকবাল খেয়াল করেনি।

লোকটি পত্রিকা পড়ছিলো। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ইকবালদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। এবার পত্রিকা থেকে মুখ সরিয়ে বলে, তোমাদের কোন সমস্যা ?

– আমরা তিনজন যাব। একজন আসেনি বা ট্রেন ধরতে পারেনি।

– যে আসেনি, ওর বাসা কোথায় ? হয়তো এয়ারপোর্ট থেকে উঠবে। লোকটির এ সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে ইকবাল বলে, বাসা মনিপুর কিন্তু বিকালে ওর শাহজাহানপুর আসার কথা ছিল, ওখান থেকে কমলাপুরই আসার কথা।

ইকবালদের অসহায় মুখ দেখে লোকটির মায়া হয়। লোকটি সান্ত্বনার সুরে বলে, তবু অপেক্ষা করো। আসতেওতো পারে। ও জানে না তোমাদের বগি নম্বর ?

জাভেদ বলে, রমিজই তো ওর শাহজাহানপুরের দুলাভাইকে দিয়ে দশ দিন আগে টিকিটি কেটেছে। যদিও টিকিটগুলো এখন আমার কাছে। কথাগুলো বলে জাভেদ পকেট হাতে ঢুকিয়ে পরখ করে দেখে, ঠিক মতো টিকিটগুলো এনেছে কি না। পকেট হাত দিয়ে জাভেদ টিকিটগুলোর অস্তিত্ব টের পায়।

– তোমাদের সাথে তো পরিচয় হলো না। আমি এইচ কবির। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদীতে কাজ করি।

– এবার ইকবাল বলে, আমি ইকবাল, এ জাভেদ আর যে এখনও আসে নি, সে রমিজ। আমরা তিনজনই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ভার্সিটিতে ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছি।

কবির সাহেব বলেন, চট্টগ্রাম এই-ই প্রথম যাচ্ছো, না আগেও গিয়েছো?

আগে কখনো যাই নি। এই-ই প্রথম, জাভেদ বলে।

কবির সাহেব বলেন, নিশ্চয় বেড়াতে যাচ্ছো, তা কক্সবাজার পর্যন্ত যাবে, না সেন্টমার্টিন ?

জাভেদ বলে, বেড়াতে মানে আমাদের বান্ধবী আনিকাকে দেখতে যাচ্ছি।

কবির সাহেব বলেন, আনিকা কোথায় পড়ে ? ভার্সিটিতে, না মেডিক্যালে ?

জাভেদ বলে, ও পড়ে না। ও সেকেন্ড লেফটেনেন্টে ঢুকেছে।

বিএমএ'তে ট্রেনিং করেছে।

কবির সাহেব বলেন, আনিকা কার বান্ধবী ? তোমার না ওর ? ইকবালকে দেখিয়ে বলেন।

জাভেদ বলে, আমাদের তিনজনেরই।

আলাপচারিতায় কিছুক্ষণের জন্য এখানে বিরতি হয়। এতোক্ষণ ইকবাল একটা কথাও বলেনি। পত্রিকা পড়ছে, না রমিজের কথা ভাবছে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না।

কবির সাহেব জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। রাতের ঢাকা এখনও জেগে আছে। বড় বড় বিল্ডিংগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। রুমে লোকজন হাঁটাচলা করছে। টিভি চলছে। কেউ বা মশারি টাঙাচ্ছে। কবির সাহেব ট্রেনে বসে এ সব স্পষ্ট দেখতে পান।

ট্রেন এয়ারপোর্ট স্টেশনের প্লাটফর্মে ঢুকতেই জাভেদ আর ইকবাল কাছিমের গলায় মতো জানালা দিয়ে গলা বের করে রমিজকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু রমিজ কেন, রমিজের চেহারার কোনো মানুষকেই ওদের চোখে পড়ে না। জাভেদ ইকবাল দুজনের চোখে মুখেই দুশ্চিন্তা আর হতাশার ছাপ।

কবির সাহেব বলেন, তোমাদের বন্ধু বুঝি এলো না ?

ইকবাল বলে, ও অই রকমই।

– অই রকম মানে ?

– মানে গল্প কবিতা লেখেতো। একটু উদাস উদাস ভাব।

আনিকা, তিন বন্ধু এবং উদাস উদাস ভাব এই নিয়ে হয়তো আগামীতে একটি গল্প লেখা হবে। কে লিখবে সেই গল্প ?

■ *লেখক : যুগ্ম পরিচালক, বিবিটিএ*

নকশি থেকে বিজয় এ কনভার্ট

মোঃইকরামুল কবীর

আমাদের প্রায় সময় নকশি ফন্ট এর সব লেখা বিজয় ফন্ট এ কনভার্ট করতে হয়। এজন্য আমরা এডইন্সের মাধ্যমে আমাদের প ূর্বের তৈরি করা ফাইলসমূহকে বিজয় এ পরিণত করে পুনরায় একই ফাইল লেখার সময় বাঁচাতে পারি। আমরা এ পর্যায়ে দেখব কীভাবে এডইন্স মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে না থাকলে আনতে হয় এবং তা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

যদি বিজয় এডইন্সমাইক্রোসফট ওয়ার্ডে না থাকে তবে তা ইন্টারনেট থেকে bijoy Add-Ins লিখে সার্চ দিয়ে (download) নামিয়ে নিন। এরপর নিম্নের লোকেশন bijoy Add-Ins ফাইলটি কপি করুন ঃ C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Word\STARTUP (For Windows Xp OS)

তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করলে মেনু বার এ নতুন মেনু হিসেবে Add-Ins পাওয়া যাবে, চিত্র নিম্নরূপঃ

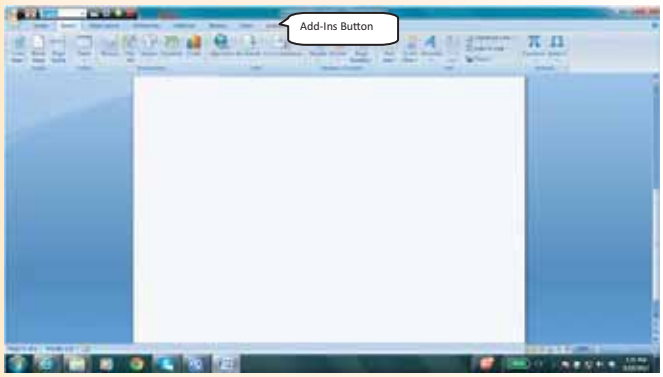

এরপর এই Add-Ins এ ক্লিক করে Bijoy Converter→Others→ Nokshi To Bijoy Classic সিলেক্ট করে আপনি আপনার নকশি ফাইলকে বিজয় এ পরিণত করে যেকোনো লোকেশন এ Save করে নিতে পারবেন।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

সেফটি ফার্স্ট

স্পেশাল সার্ভিস

আদর্শ পরিবহন

২০১৩ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

সানজানা বিন্‌তে আজাদ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা :দিলরুবা রায়হান
পিতা :একেএম মহিউদ্দিন আজাদ
(ডিজিএম, এইচআরডি-১, প্রকা)

প্রত্যাশা সাহা
ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা :শিউলী সাহা
(এএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা :জয়দেব কুমার সাহা
(ডিডি, এএসডিডি, প্রকা)

মোঃ জামিউল হাসান শাওন
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা :শামীমা বেগম
পিতা :মোঃজাফরুল হক
(জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্রকা)

ফেন্সী সাংমা
নটরডেম কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা :জেনিতা সাংমা
পিতা :ফেলিক্সাংমা
(কেয়ারটেকার ১ম মান ক্যাশ, মতিঝিল অফিস)

নাজমুন নাহার তন্বী
খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা:মোছাঃকামরুন নাহার
পিতা:মোঃমনোয়ার হোসেন
(জেডি, খুলনা অফিস)

সোহেলী ইসলাম রীতু
সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা:মাসুদা রহমান
পিতা:মোঃশহিদুল ইসলাম পাড়
(ডিডি, খুলনা অফিস)

পল্লবী রায় তৃণা
এম.সি. কলেজ, সিলেট (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:রীতা রানী সরকার
পিতা:বিনয় ভূষন রায়
(এএম ক্যাশ, সিলেট অফিস)

সৌমিত্র দাস শুভ্র
এম.সি. কলেজ, সিলেট (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:কাকলী রানী রায়
পিতা:সতীশ চন্দ্র দাস
(এএম ক্যাশ, সিলেট অফিস)

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ ওয়াহেদ সাদিক
রংপুর জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা :শাহিদা বেগম
পিতা:মোঃসেকেন্দার আলী
(ডাটা এন্ট্রিকন্ট্রোল অপারেটর, রংপুর অফিস)

মোঃ আবীর হাসান
গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা :মোছাঃআনজুমান আরা
পিতা :মোঃআব্দুল মান্নান
(এডি, রাজশাহী অফিস)

শামীমা সুলতানা
সরকারী করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:মাহামুদা বেগম
পিতা:মোঃআঞ্ছত্তার
(কেয়ারটেকার ২য় মান, খুলনা অফিস)

শেখ মেহেদী হাসান
নড়াইল সরকারি মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়

মাতা :তাহমিনা খাতুন
পিতা :শেখ শাহাবুদ্দিন
(জেডি, খুলনা অফিস)

মোঃ আমিরুল ইসলাম (নিলয়)
উত্তরা হাই স্কুল, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:মরহুমা আঞ্জুমান আরা ইসলাম
পিতা:মোঃনুরুল ইসলাম
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

মোঃ নাজমুস সাকিব (অরিক)
সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ), ২০১২

মাতা :আনজুমান আরা বেগম
পিতা :মোঃআবু হোসেন
(জেডি, ইইএফ ইউনিট, প্রকা)

রওনাক বিনতে রফিক (মালিহা)
মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ), ২০১২

মাতা :নাসরিন সুলতানা
পিতা :মোঃরফিক উল্যা
(জেডি, এএসডিডি, প্রকা)

২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মাহদি মুহাম্মাদ তাহমিদ
আইডিয়াল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাতা :নাসরিন সুলতানা
পিতা :মোঃরফিক উল্যা
(জেডি, এএসডিডি, প্রকা)

এম.সাদমান রাফিদ (প্রিয়ম)
সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল

মাতা :আনজুমান আরা বেগম
পিতা :মোঃআবু হোসেন
(জেডি, ইইএফ ইউনিট, প্রকা)

সুরাইয়া বিনতে শিহাব
নড়াইল সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মাতা :তাহমিনা খাতুন
পিতা :শেখ শাহাবুদ্দিন
(জেডি, খুলনা অফিস)

চতুর্থ পর্ব

আদিম সমাজ

ভারতবর্ষের মুদ্রা

ভারতবর্ষের মানুষেরাও খুব পুরোনো আমল থেকেই সভ্য বলে আমরা জানি। প্রাচীন আমলে মানুষ কেবল কৃষির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। সে জন্য যেসব এলাকায় নদী ছিল, জমি উর্বর ছিল, সেসব এলাকায় মানুষ বসতি গড়ে। ভারতবর্ষের সব স্থানে নদীগুলো জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব নদীতে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা বা প্লাবন হয়। ফলে নদীতীরের জমিতে প্রচুর পলিমাটি জমে। এতে করে জমি হয় উর্বর। আর চাষিরা কম পরিশ্রমে প্রচুর ফসল ফলাতে পারে। তা ছাড়া নদীপথে চলাচল ও জিনিসপত্র এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ। এ জন্য এখানে দ্রুত জনবসতি গড়ে উঠে। প্রথমে নদীর অববাহিকাকে ঘিরে জনবসতি শুরু হলেও দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে।

ভারতবর্ষে ঠিক কখন কীভাবে মুদ্রা চালু হয় সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে মনে করা হয় যে, চীন বা লিডিয়ার কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষেও মুদ্রা চালু হয়। এখানকার মুদ্রা যে চীন বা লিডিয়ার মুদ্রা দেখে বানানো হয়নি তার প্রমাণও আছে। ভারতবর্ষে মুদ্রা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কড়ি ও গরুর অসুবিধাগুলো ধীরে ধীরে মানুষ বুঝতে পারে। তখন তারা এর বিকল্প খুঁজে বেড়াতে থাকে। একসময় তারা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অলংকার ব্যবহার শুরু করে। অলংকারকে টাকা হিসেবে গ্রহণ করার সময় অলংকারটি কী ধাতু নিয়ে বানানো হয়েছে তা নিয়ে মানুষ ভাবে। অর্থাৎ অলংকারটি যদি সোনা দিয়ে বানানো হয়ে থাকে তাহলে এর দাম অনেক বেশি হয়। আবার অলংকারটি যদি রুপা বা তামা ইত্যাদি দিয়ে বানানো হয়ে থাকে তাহলে এর দাম ততটা হয় না। পরে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অলংকার তৈরির প্রয়োজন নেই। কেবল মূল্যবান ধাতু বলে নিশ্চিত হওয়া গেলেই এটি নেওয়া যেতে পারে। তখন থেকেই ভারতবর্ষে সোনা দিয়ে পণ্য বিনিময়প্রথা শুরু হয়। ভারতের অনেক বড় বড় নদীর বালি ধুয়ে সে সময় সোনা পাওয়া যেত। তা ছাড়া দক্ষিণ ভারতেও সোনা পাওয়া যেত। লেনদেনের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও তিব্বত থেকেও সোনা আসত। পরে সোনা ছাড়া আরও কিছু ধাতু দিয়েও বিনিময় করার ব্যবস্থা চালু হয়।

টাকা হিসেবে ধাতুকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এর ওজন ও খাঁটিত্ব। অর্থাৎ সোনার ক্ষেত্রে এটি খাঁটি সোনা, না-কি ভেজালমেশানো সোনা এটি নির্ধারণ করার জন্য পণ্যবিক্রেতাকে কষ্টিপাথর নিয়ে ঘুরতে হতো। আবার ধাতু মাপার জন্য প্রয়োজন হতো সূক্ষ্ম দাঁড়িপাল্লার। দাঁড়িপাল্লা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল; সেটি হচ্ছে বাটখারার মান স্থির করা। এ জন্য অবশ্য একই রকম আকার ও ওজনের বীজ বাটখারা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হলো। সোনা মাপার জন্য ভারতবর্ষের সর্বত্র কুঁচ বা কুঁচফল ব্যবহার করা হতো আধুনিক দাঁড়িপাল্লা বানানোর পূর্ব পর্যন্ত। কুঁচফল দেখতে ছোট্ট এবং লাল রংয়ের। উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় অ্যাব্রাস প্রিক্যাটোরিয়াস। কুঁচফল দেখতে খুবই সুন্দর। তাই বাঙালি কবি লিখেছেন, কুঁচবরণ কন্যারে তোর মেঘবরণ কেশ। এক একটি কুঁচফলের ওজন এক রতি বা পৌনে দুই গ্রেন। সাধারণভাবে ৮৪ কুঁচে এক তোলা বলে ধরা হতো। কুঁচ ছাড়াও যব, ধান বা মাসকলাই দিয়ে সোনা পরিমাপের রীতি কোনো কোনো এলাকায় ছিল।

মূল্যবান ধাতুর মাধ্যমে পণ্যবিনিময় করার জন্য প্রতিবারই দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপামাপি করতে হতো। এতে কোনো জিনিস কেনাবেচার কাজে অনেক সময় লাগত। এই সময় কমানোর জন্য একটা নির্দিষ্ট মাপের ও মূল্যের ধাতু ব্যবহার করা যায় কি-না তা গভীরভাবে ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু এ পদ্ধতিরও নানা সমস্যা আছে। ধাতুর টুকরোটি সঠিক ওজনসম্পন্ন কি-না, এটি খাঁটি কি-না এবং সঠিক মূল্যের কি-না ইত্যাদি বিষয় মুদ্রা গ্রহণকারীকে ভাবাত। তখন সমাজের কোনো দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয়ের ছাপমারা ধাতুর প্রচলন হয়। এরূপ ছাপমারা ধাতুটি খাঁটি ও সঠিক ওজনের হবে বলে ধরে নেওয়া হতো এবং নিশ্চিন্তে গ্রহণ করা হতো। এভাবেই ভারতবর্ষে মুদ্রার উদ্ভাবন হলো।

এ পর্যায়ে ব্যবসায়ীরা নতুন প্রচলিত মুদ্রা খুব আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করল। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা সোনারূপার টুকরো ব্যবহারের চাইতে নির্দিষ্ট ওজনের খাঁটি ধাতু গ্রহণ করা অনেক সহজ। কিছুদিন পর এক্ষেত্রেও দেখা দিল সমস্যা। যারা মুদ্রা তৈরি করত তারা এতে ভেজাল দেওয়া শুরু করল। তারা তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাতু প্রদানের বদলে কম পরিমাণ ধাতু বা সোনার সঙ্গে অন্য কম দামের ধাতু মিশিয়ে দেওয়া শুরু করল। তখন মানুষ সকলের তৈরি মুদ্রা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করত না। কেবল সৎ, প্রভাবশালী এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কর্তৃক বানানো মুদ্রাই মানুষ গ্রহণ করত। ফলে এ ব্যবস্থা আটকে গেল একটা সীমিত এলাকায়। অর্থাৎ ওই সৎ মানুষটাকে যারা চেনেন বা তার সম্পর্কে জানেন তারাই কেবল তার তৈরি মুদ্রা নিতে চাইত। কাজেই দূরবর্তী কোনো স্থানে বাণিজ্য করার জন্য এসব মুদ্রা নিয়ে যাওয়া যেত না। এ পর্যন্ত মুদ্রা তৈরি লেনদেন করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল ব্যবসায়ীদের। কারণ ব্যবসায়ীদের যেহেতু প্রতিনিয়তই লেনদেন করতে হয় তাই মুদ্রা চালু করতে পারলে তাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু তারা মুদ্রা আবিষ্কার ও প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রচলন করার পরই থমকে যান। কারণ তাদের পক্ষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সকলেই বিশ্বাস করেন এমন মুদ্রা বানানো সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেশের রাজারা মুদ্রা বানানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজাদের তৈরি মুদ্রা যথাযথ মানসম্পন্ন ছিল বলে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। একপর্যায়ে মুদ্রা বানানোর অধিকার কেবল রাজাদের কাছেই চলে আসে। অর্থাৎ রাজা ছাড়া অন্য কোনো লোক মুদ্রা বানাতে পারত না। এগুলো হচ্ছে টাকশালে মুদ্রা বানানো শুরু করারও অনেক অনেক দিন আগের কথা।

ভারতবর্ষে মুদ্রার প্রথম যুগ

আদিকালে ভারতবর্ষে ঠিক কখন কীভাবে মুদ্রা তৈরি শুরু হয় তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় চারশ বছর আগে এখানে রাজত্ব করতেন প্রতাপশালী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর সচিব কৌটিল্য রচিত একটি বই থেকে জানা যায় যে, সে আমলে কূটরূপকারকরা রাজার পক্ষে কালমুদ্রা তৈরি করত। এক্ষেত্রে মুদ্রা তৈরির যন্ত্রপাতির তালিকাও তিনি দিয়েছেন। মুদ্রা তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে প্রথমে ধাতু গলিয়ে তা ক্ষার দিয়ে শোধন করা হতো। তারপর ওই ধাতুকে ঠাণ্ডা করে নেহাইয়ের ওপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পাতলা পাতে পরিণত করা হতো। তারপর পাতগুলোকে শক্ত কাঁচি দিয়ে কেটে নির্দিষ্ট মাপে টুকরো

টুকরো করা হতো। সবশেষে এই টুকরোগুলোর উভয় পিঠে নানারকম চিহ্নযুক্ত ছাপ মারা হতো। ছাপ মারার জন্য নির্ধারিত ডিজাইন কাটা ছকে একটি করে টুকরো ঢুকিয়ে তার ওপর অন্য একটি ডিজাইন করা লোহার ঢাকনা দিয়ে জোরে চাপ দেওয়া হতো। বর্তমান সময়েও বিশ্বের সকল টাকশালে এ প্রক্রিয়াতেই মুদ্রা বানানো হয়। তখনকার মুদ্রাগুলোর নির্ধারিত কোনো সাইজ ছিল না। হাতে বানানো পিঠার যেমন নির্ধারিত কোনো সাইজ নেই ঠিক তেমনি। এগুলো ছিল কূটরূপকারকদের ইচ্ছে অনুসারে ডিজাইন করা। তাই এগুলোর আকার কখনও হতো গোল, কখনও ডিমের মতো, কখনও-বা অর্ধবৃত্তের মতো। চারকোণা বা তিনকোণা আকারের মুদ্রাও তখন বানানো হতো। আবার মুদ্রা বানানোর পরে কোনো মুদ্রায় ধাতুর পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে সেটি কেটে কিছুটা ছোট করার প্রমাণও পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র আকারের টাকা তৈরির ক্ষেত্রে ধাতু গলিয়ে মাটির ছোট ছোট গর্তে ঢেলে দেওয়া হতো এবং এতে করে বিভিন্ন আকারের মুদ্রা তৈরি হতো। ভারতবর্ষে চালু হওয়া প্রথম মুদ্রাগুলো ছিল ছাপকাটা। এগুলোকে তাই পাঞ্চ-কাটা মুদ্রা বলা হয়। পরবর্তীকালে এ মুদ্রাগুলো মানুষ অন্যান্য প্রয়োজনে গলিয়ে ফেলেছে। তাই পৃথিবীর কোনো জাদুঘরে ভারতের সুপ্রাচীন মুদ্রা দেখা যায় না। ছাপকাটা এসব মুদ্রায় কোনো লেখা দেখা যেত না। এগুলোর আকার আলাদা হলেও ওজন কিন্তু সমান ছিল। এখানে তামা দিয়ে প্রথমে মুদ্রা বানানো হতো। এই তামার মুদ্রাই মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব কাজে লেগেছে। ব্যবসা করে মানুষেরা সহজেই ধনী হতে পেরেছে। এতে করে তামার মুদ্রায় আর তাদের চাহিদা মেটেনি। কারণ বড় অঙ্কের লেনদেন করতে হলে তামার অনেক মুদ্রা দিতে হতো। আবার দূর দেশে বাণিজ্যে যেতে হলেও অনেকগুলো তামার মুদ্রা বহন করতে হতো। তাই তাদের জন্য দরকার হলো আরও দামি মুদ্রা। সে জন্য তারা তৈরি করেছিল রূপার মুদ্রা। তামার মুদ্রার পাশাপাশি এই রূপার মুদ্রাও চলেছে অনেকদিন। আবার এ দেশে তামা ও রূপা মিশিয়েও মুদ্রা বানানো হয়েছে। এসব মুদ্রা ছিল বিচিত্র আকৃতির। কোনোটি গোলাকার, কোনোটি চারকোণা। আবার বহু কোণাওয়ালা মুদ্রা ছিল। মুদ্রাগুলোতে খোদাই করা হতো খেয়ালখুশিমতো নানা আজগুবি চিহ্ন। তবে এসব চিহ্নের বেশিরভাগই ছিল সূর্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন এই পাঞ্চ-কাটা মুদ্রায় তিনশ বা তারও বেশি চিহ্ন আঁকা হতো বলে জানা গেছে।

পৃথিবীতে বৌদ্ধমতবাদ প্রচার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি একটি গাছের নিচে বসে ধ্যান করেছিলেন। অবশেষে তিনি এখানে বসেই পেয়েছিলেন সত্যজ্ঞান। তিনি প্রচার করেছেন, অহিংসা পরম ধর্ম। তিনি যে গাছের নিচে বসে ধ্যান করেছিলেন তার নাম বোধিদ্রুম। দ্রুম শব্দের অর্থ হলে গাছ। এটি অশ্বত্থগাছেরই একটি প্রজাতি। এই গাছের ছালওয়ালা মুদ্রা চালু করা হয়েছিল ভারতবর্ষে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই মুদ্রা চালু ছিল বলে মনে করা হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আগস্ট, ২০১২ : ১১৪৬১.৩৮
২৯ আগস্ট, ২০১৩ : ১৬২৫২.২৭

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আগস্ট ২০১২ : ১৯৫১.৪৮
জুলাই- আগস্ট, ২০১২-১৩ : ৪৩৯০.৫৬
আগস্ট ২০১৩ : ২০১৩.৪৪
জুলাই-আগস্ট, ২০১৩-১৪ : ৫০৩৭.৭৩

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আগস্ট ২০১২ : ১১৭৮.৬৫
জুলাই-আগস্ট ২০১২-১৩ : ২৩৭৯.৮০
আগস্ট ২০১৩ : ১০০৮.২০
জুলাই-আগস্ট ২০১৩-১৪ : ২২৪৭.১৬

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

জুলাই ২০১২ : ২৮৬৫.০৭
২০১১-১২ অর্থবছরে - ৩৭০৩৫.৮২
জুলাই ২০১৩ : ৩৭১৭.৭৫
২০১২-১৩ অর্থবছরে - ৩৫৯৮৪.৬২

রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)

জুলাই ২০১২ - ৬৪৩১.৬২
২০১১-১২ অর্থবছরে - ৯৫০৫৮.৯৯
জুলাই ২০১৩ - ৭৭৭১.৬৫
২০১২-১৩ অর্থবছরে - ১০৮৬১৪.৮৯

জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ (নীট বিক্রয়) (কোটি টাকায়)

জুলাই ২০১২ - ২০৯.১১
২০১১-১২ অর্থবছরে - ৪৭৯.০২
জুলাই ২০১৩ - ৬২৪.৯৩
২০১২-১৩ অর্থবছরে - ৭৭২.৮৪

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৫৬
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৪.৯৭
আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.১৯
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৩৯

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ ক্যান্টিন

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় এক নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তর করা হলো এবং নামকরণ হলো 'বাংলাদেশ ব্যাংক'। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ মোতাবেক এটি করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হতে তা কার্যকর। বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্মের পর পরই এতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ ক্যান্টিন। বর্তমান ৩০তলা ভবনের স্থলে তখন একটি টিন শেড ঘরে কেন্টিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সেসময় কুপন সিস্টেমে চলত খাবার সরবরাহ। টোকেন বিক্রি করা হতো সাপ্তাহিক ভাবে এবং পরবর্তীতে তা মাসিক করা হয়েছিল। খাবার তালিকায় সপ্তাহে দুই দিন মাংস ও তিন দিন মাছ থাকত। '৭০ এর দশকে কর্মকর্তাদের ১ টাকা ২৫ পয়সা ও কর্মচারীদের জন্য ১ টাকায় লাঞ্চ সরবরাহ করা হতো। সকাল ১০-১১ টায় ও বিকাল ৩-৪টায় চা ও দু'টো বিস্কুট পাওয়া যেত মাত্র ২৫ পয়সায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসের কল্যাণ শাখা এ ক্যান্টিন পরিচালনা করত। কল্যাণ শাখার কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলে একটি টিম তৈরি করা হতো, তারা বাজার করাসহ সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সেবামূলক কর্মকাণ্ড তাই প্রতি বছর বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যান্টিন পরিচালনায় ভর্তুকি (সাবসিডি) দিত। এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকর্তারা সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পেতেন।

পরবর্তীতে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা ক্যান্টিন পরিচালিত হলেও ব্যাংক কর্তৃক নগদ অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ক্যান্টিন থেকে লাঞ্চ গ্রহণ করতে পারতেন অথবা নগদ অর্থও নিতে পারতেন। এক্ষেত্রে ক্যান্টিনে অনেকে খাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ১৯৯২ এর পূর্বে লাঞ্চ সাবসিডি ১০ টাকা হিসেবে দেয়া হতো এবং ১৯৯২ এ এসে তা ১৩ টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৩ টাকা থেকে ১৬ টাকা করা হয় ১৯৯৪ সালে, ১৬ থেকে ২০ এ উন্নীত হয় ১৯৯৯ এ এরপর ২০০২ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২৪ টাকায়, দুই বছর পর ২০০৪ এ তা হয় ৪৫ টাকা এবং ২০০৮ এ ৭৫ টাকা। পরবর্তীতে লাঞ্চ সাবসিডি হয় ১৫০ টাকা এবং বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০ টাকায়।

২০০৪-০৫ এ মতিঝিল অফিস কল্যাণ শাখা কর্তৃক ক্যান্টিন পরিচালনার দায়িত্ব টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেসরকারি ক্যাটারার সার্ভিসকে দেয়া হয়। প্রতিটি টেন্ডারের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য ক্যাটারার নিযুক্ত হয়। বেসরকারিভাবে ক্যাটারার সার্ভিসের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও এর আসবাবপত্র, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফ্যান, এসি, চুলা, তৈজসপত্র ইত্যাদি সকল জিনিস ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অর্থাৎ ক্যান্টিনের সকল প্রকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক করা হয়। তবে খাওয়ায় ব্যবহৃত প্লেট, পিরিচ, জগ, গ্লাস, কাপ ইত্যাদি ক্যাটারার সার্ভিস কর্তৃক প্রদত্ত।

বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ ক্যান্টিনটি বাংলাদেশ ব্যাংক ১ম সংলগ্নী ভবনের নীচতলায় অবস্থিত। প্রায় ৫০০০ বর্গফুটের এই ক্যান্টিনটিতে প্রতিদিন ১১০০-১২০০ কর্মকর্তা কর্মচারী মধ্যাহ্নভোজ করেন। মধ্যাহ্নভোজে ভাত, ডাল ও ভাজির সাথে মুরগি, খাসির মাংস, বিভিন্ন প্রকার মাছ, ডিম পাওয়া যায়। এছাড়া যারা লাঞ্চ-এ রুটি খেতে পছন্দ করেন তাদের জন্য রুটির ব্যবস্থাও আছে। সকালের নাস্তায় রুটি, পরোটা, চা, সিংগাড়া, সমুচা ইত্যাদি থাকে। বিকেলে থাকে চিকেন ফ্রাই, ফেঞ্চ ফ্রাই, দই, ফিরনি ইত্যাদি। সকল খাবার ব্যাংক নির্ধারিত দামে বিক্রয় করা হয়।

দুপুরের খাবারের সময় স্টাফ কেন্টিনের পরিচিত দৃশ্য

যারা এই ক্যান্টিনে নিয়মিত লাঞ্চ করেন বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ ক্যান্টিনের সেবা সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কেউবা কিছু অভিযোগ তুলে ধরেন যেমন-রান্না ভালো নয়, প্লেট গ্লাস অপরিস্কার, খাবার ও টোকেন নেবার লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সময়ের অপচয়, বসায় জায়গার অভাব বিশেষ করে মহিলা কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় বসার জায়গা সমস্যা ইত্যাদি। তবে এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি বড় সেবা। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সাশ্রয়ী মুল্যে, সুন্দর পরিবেশে, স্বাস্থ্য সম্মত লাঞ্চ ও নাস্তা পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চেষ্টা আর ভালবাসাই এই ক্যান্টিনটিকে আরও সুন্দর ও উন্নত করতে পারবে।

■ *সোনিয়া ইয়াসমিন, এডি, ডিসিপি*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।